দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

৬৮ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ৩০ মে ২০১৬।। ১৬ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

সর্বানন্দ সোনোয়াল
অসমে সাফল্যের কাণ্ডারি

ও রাজাগোপাল
কেরলে নির্বাচিত
একমাত্র বিজেপি বিধায়ক

দিলীপ ঘোষ
খড়্গপুর থেকে নির্বাচিত

স্বাধীন সরকার
বৈষ্ণবনগর থেকে নির্বাচিত

মনোজ টিগ্গা
মাদারীহাট থেকে নির্বাচিত

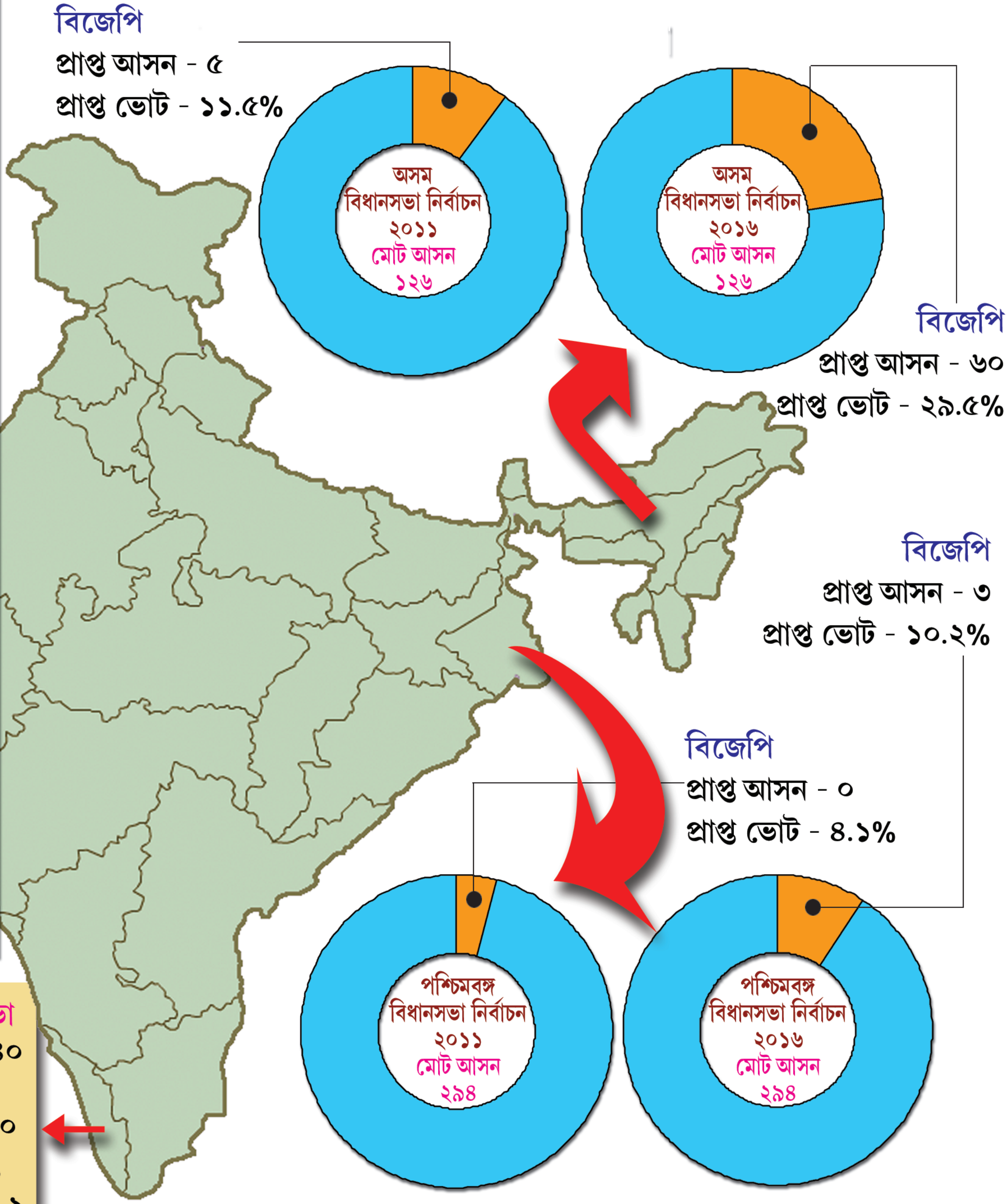

কেরল বিধানসভা
মোট আসন - ১৪০
বিজেপি
২০১১ - আসন-০
প্রাপ্ত ভোট ৬%
২০১৬ - আসন - ১
প্রাপ্ত ভোট - ১০.৫%

● পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৭টি আসনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ● কমপক্ষে ১০০টি আসনে নির্ণায়ক শক্তি বিজেপি ● রাজ্যে বিজেপির মোট প্রাপ্ত ভোট ৫৬ লক্ষের বেশি।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৩০ মে - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

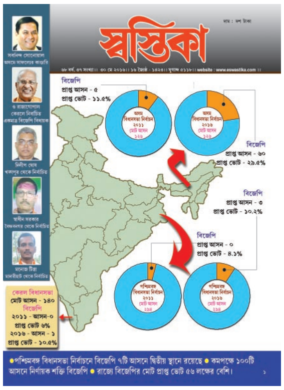

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবোধের প্রতি বাংলার মানুষের মনে আস্থা জাগছে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : জনতা ক্ষমা করেছে, তাই এই ক্ষমতা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

সুবিজ্ঞ ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্ব ! ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

কমিউনিজমের শোকযাত্রায় শাপমুক্তি বাংলার ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ১৪

রাজ্য বিধানসভা তিনটি আসন জিতে বড় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল বিজেপি ▯ অম্লানকুসুম ঘোষ ▯ ১৬

অসমে অনুপ্রবেশ বন্ধই সর্বানন্দের প্রথম কাজ ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ১৮

কমরেডদের ডাক ▯ রাধাকান্ত মণ্ডল ▯ ২০

দেবর্ষি নারদ ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ২১

রাধাতত্ত্ব ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২৩

উত্তরাখণ্ড পর্বের পরবর্তী কংগ্রেস ▯ প্রতাপভানু মেহতা ▯ ২৭

বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ : আঞ্চলিকতাবাদের পৃষ্ঠভূমি উত্তরবঙ্গে জাতীয়তাবাদের মহড়া ▯ সাধনকুমার পাল ▯ ২৯

জলের জন্য হাহাকার, কুয়ো খুঁড়ছে পিপানটোলা ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** ▯ **অঙ্গনা : ২৬** ▯

অন্যরকম : ৩৩ ▯ **পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫-৩৬** ▯

সমাবেশ-সমাচার : ৩৭-৩৮▯ **খেলা : ৩৯** ▯

শব্দরূপ : ৪০ ▯ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৬ জুন, '১৬

প্রকাশিত হবে ৬ জুন, '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মোদী সরকারের দু'বছর

সম্প্রতি মোদী সরকারের দু'বছর পূর্ণ হলো। যে কোনো সরকারের পক্ষেই প্রথম দু'বছর হলো যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটারদের সমর্থন পাওয়া গেছে তা পূরণের প্রস্তুতি, ক্ষেত্রবিশেষে তা রূপ দেওয়ার পালা। মোদী সরকার জনধন যোজনা থেকে উজালা গ্যাস প্রকল্প, বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করা থেকে দেশের অর্থনৈতিক হার বৃদ্ধির মতো অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিশ্রুতি পালনে তৎপর। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে তার স্বীকৃতিও দেখা গেছে। এইসব বিষয়গুলি নিয়ে লিখেছেন সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিমন্যু গুহ, অম্লান ঘোষ, অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল -
৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কংগ্রেস মুক্ত ভারতের লক্ষ্যে বিজেপি

আপাতদৃষ্টিতে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের সঙ্গে জাতীয় রাজনীতির সম্পর্ক ক্ষীণ। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল এই ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। জাতীয় রাজনীতির বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তো বটেই, এমনকী কেন্দ্রের মোদী সরকারের কার্যধারার উপরও এই ফলাফলের প্রভাবের সম্ভাবনা প্রবল। অরুণাচল ও উত্তরাখণ্ডে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করিয়া যখন বিজেপি প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন তখন পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফলে তাহাদের উল্লসিত হইবার কারণ আছে। স্বাধীনতার পর তিন দশক কংগ্রেসই ছিল একমাত্র সর্বভারতীয় দল। ১৯৮০-র দশক থেকে তাহা পরিবর্তিত হইতে শুরু করে। বিভিন্ন রাজ্যে দেখা যায় আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান। এইবারের নির্বাচনে বিজেপি এই প্রথম কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিল। কংগ্রেস মুক্ত ভারতের লক্ষ্যে বিজেপি অনেকটাই অগ্রসর হইল। দেশের ৭ শতাংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করিয়া কংগ্রেস এখন মাত্র ছয়টি রাজ্য শাসন করিতেছে। অন্যপক্ষে দেশের ৩৫ শতাংশ জনসংখ্যার প্রতিনিধি হিসাবে বিজেপি এখন দেশের ১৪টি রাজ্যে ক্ষমতাসীন। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনের পর বিজেপি দলের রাজনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে কংগ্রেস মুক্ত ভারতের স্লোগান তুলিয়াছিল। ইহা যে শুধু স্লোগান সর্বস্ব নয়, কংগ্রেসমুক্ত ভারত যে এখন সময়ের অপেক্ষা মাত্র, সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফলাফল তাহাই স্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল অসমে বিজেপি-জোটের ক্ষমতা লাভ। এই প্রথম উত্তরপূর্ব ভারতের কোনো রাজ্যে সরকার গঠন করিল বিজেপি। দলীয় সভাপতি অমিত শাহের 'কচ্ছ থেকে কামরূপ পর্যন্ত আমাদের প্রসার সুনিশ্চিত হইল'—উক্তিই অসমে বিজেপির জয়লাভের তাৎপর্য স্পষ্ট করিয়া দেয়। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলের ফলাফল জানাইয়া দিল—এখন একমাত্র সর্বভারতীয় দলটির নাম বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নিজস্ব শক্তিতে মাত্র দুটি জেলা—মালদা ও মুর্শিদাবাদেই সীমাবদ্ধ। বাকি যে কয়টি পাইয়াছে তাহা মাকু পার্টির সহায়তায়, যাহা সুবিধাবাদী রাজনীতির চূড়ান্ত। 'উত্তর ভারতের দল' তকমাটি হইতে বিজেপি এখন মুক্ত। উত্তর ভারতের বাহিরেও বিজেপির রাজনৈতিক পুঁজি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে। কেরলে কংগ্রেস সরকারের পরাজয় এবং পাশাপাশি তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকে এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের রাজনৈতিক দূরত্বও বিজেপির পক্ষে আহ্লাদিত হইবার যথেষ্ট কারণ।

একইসঙ্গে এআইডিএমকে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জয় কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রেও কিছুটা সহায়ক হইবে। বিজেপির সঙ্গে মতাদর্শগত পার্থক্যের কথা জানাইয়া দিয়াও তৃণমূল নেত্রী 'মানুষের স্বার্থে' কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক সহযোগিতার কথা বলিয়াছেন। রাজ্যসভায় জিএসটি বিল পাশ করাইবার ক্ষেত্রে যাহা সহায়ক হইবে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুসম্পর্কও একইভাবে রাজ্যসভায় প্রতিফলিত হইতে পারে। অর্থাৎ এক কথায় 'অ্যাডভান্টেজ বিজেপি'।

অন্যদিকে, ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে শুরু হওয়া কংগ্রেসের পতন যে আজও অব্যাহত, অসম ও কেরলের পরাজয়ে তাহা প্রমাণিত। মাত্র ছয়টি রাজ্যে এখন কংগ্রেসের সরকার। কর্ণাটক বাদে বাকি পাঁচটির রাজনৈতিক গুরুত্ব সামান্যই। ভারতের প্রাচীনতম দলটিকে এখন আঞ্চলিক রাজনৈতিক শক্তির মর্যাদা দেওয়াও বেশ মুশকিল। কংগ্রেসের এই নিরাশাজনক অবস্থার জন্য স্পষ্টতই রাহুল গান্ধী দায়ী। সত্যি বলিতে কী, রাহুল গান্ধীর পদত্যাগ করিবার এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। যদিও গান্ধী পরিবার ব্যতীত কংগ্রেসের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার অন্য উপায় নাই। সোনিয়া-রাহুলের প্রতি কংগ্রেসীদের যে অত্যধিক প্রীতি এবং একপেশে ভাবনা রহিয়াছে তাহা বুঝিয়াই সোনিয়া গান্ধী আশার আলো জ্বালাইতে বলিয়াছেন—কোনো ব্যর্থতাই স্থায়ী নয়, তাই আদর্শচ্যুত হওয়া চলিবে না। প্রশ্ন হইল, কংগ্রেসের আদর্শটি কি? বাংলায় বামেদের সহিত দোস্তি আর কেরলে তাহাদেরই সহিত কুস্তি? ইহা আদর্শ না সুবিধাবাদ? ভ্রষ্টাচার ও সুবিধাবাদী রাজনীতির কারণেই 'কংগ্রেস মুক্ত ভারত' হয়তো খুব দূরে নয়।

সুভাষিতম্

অন্তঃসারবিহীনানাম্ উপদেশো ন জায়তে।
মলয়াচলসংসর্গান্ ন বেণুশ্চন্দনায়তে।।
যেমন মলয় পর্বতের সংস্পর্শে বাঁশ চন্দনে পরিণত হয় না, সেরূপ যারা অন্তঃসারশূন্য তাদের উপদেশ দিয়ে কোনো ফল হয় না।

নির্ণায়ক শক্তি তো বটেই, রাজ্য-রাজনীতিতে বড় শক্তি হওয়ার দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লাল প্রায় নিশ্চিহ্ন। সবুজের সুনামি। তারই মধ্যে গেরুয়ার উজ্জ্বল আভাস। বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগেই দাবি করেছিলেন, এবার তাঁরাই হবেন নির্ণায়ক শক্তি। ফল ঘোষণার পর দেখা গেল, নির্ণায়ক শক্তি তো বটেই, আগামী দিনে রাজ্য রাজনীতিতে বড় শক্তি হওয়ার দিকে অনেকটাই এগিয়ে গেল বিজেপি। রাজনীতিতে প্রায় আনকোরা মুখ দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে বিজেপি তিনটি আসন পাওয়ার পাশাপাশি পেয়েছে ১০.২ শতাংশ ভোট। সেই সঙ্গেই অন্তত ১০০টি আসনে বাম-কংগ্রেস জোটের প্রার্থীদের জয়-পরাজয়ের ব্যবধানের চেয়ে বেশি ভোট লাভ। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, কতগুলি আসন পেয়েছি, সেটা জরুরি নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো, 'গোটা রাজ্যে— কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার আমাদের বিস্তার হয়েছে। প্রায় ৫৬ লক্ষ ভোট আমরা পেয়েছি'। এ রাজ্যে বিজেপি ১০ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পেয়েছিল ১৯৯১ সালে। সেই সময় গোটা দেশ জুড়ে রামজন্মভূমি আন্দোলনের আবহ ছিল। তখন এ রাজ্য থেকেও বহু যুবক-যুবতী করসেবক হিসাবে অযোধ্যায় গিয়েছিলেন। সেই উত্তেজক আবহে বিজেপির ভোট এক লাফে ১০ শতাংশ বেড়ে গিয়েছিল। এবার তা নেই। বিজেপির পক্ষে আপাত প্রতিকূল এই পরিস্থিতিতে ১০ শতাংশের বেশি ভোট পাওয়াটা নিশ্চিতভাবেই আশাব্যঞ্জক।

গত লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদীর উপর ভর করে এরাজ্যে প্রায় ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল বিজেপি। অর্থাৎ এক লাফে বেড়েছিল ১০.২ শতাংশেরও বেশি ভোট। এবারের নির্বাচনে এরাজ্যে বিজেপি পেয়েছে ৫৬ লক্ষ ভোট। সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্রে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। দু'বছর পর এরাজ্যে নির্বাচনে যখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সামান্য হলেও প্রতিষ্ঠান বিরোধী হাওয়া রয়েছে, এই পরিস্থিতিতে এ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল দেখলে আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গে আশার আলো দেখতেই পারে বিজেপি।

এর আগে যে দু'জন বিজেপির টিকিটে বিধানসভায় গিয়েছিলেন সেই বাদল ভট্টাচার্য ও শমীক ভট্টাচার্য যথাক্রমে ১৯৯৯ ও ২০১৪-র উপনির্বাচনে জিতে বিধায়ক হন। এবারই প্রথম সাধারণ নির্বাচনে অর্থাৎ পুরো মেয়াদের জন্য বিজেপি শুধু সফলই নয় এক লাফে তাদের আসন বেড়ে তিনে পৌঁছে গেছে। খড়্গপুর, বৈষ্ণবনগর ও মাদারিহাট থেকে এক সঙ্গে তিনজন বিধায়ক পেল বিজেপি। বৈষ্ণবনগরে স্বাধীন সরকার এবং মাদারিহাটে মনোজ টিগ্গা, খড়্গপুরে দিলীপ ঘোষ। বিজেপির এক নেতার কথায়— একটা থেকে তিনটে। মানে ৩০০ শতাংশ বৃদ্ধি।

আসন ভিত্তিক ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ২৬২টি আসনে বিজেপি ১০ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছে। তার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর ভবানীপুর-সহ তারা ২০ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছে প্রায় ৬০টিরও বেশি আসনে। মমতার নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে ২০১১-তে বিজেপি পেয়েছিল ৫০৭৮টি ভোট। সেখানে এবারে চন্দ্র বোস পেয়েছেন ২৬,২৯৯টি ভোট। চন্দ্রবাবুর মতো রাজনীতিতে প্রায় নতুন মুখের এত ভোট পাওয়া বিজেপির পক্ষে বাস্তবিকই আশাব্যঞ্জক।

ভোটের ফলাফল দেখে বিভিন্ন জেলা থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিজেপির নেতৃত্ব মনে করছেন এরাজ্যে আগামীদিনে দ্বিতীয় শক্তি তারাই হবে এবং ২০১৯ সালে মমতার প্রধান প্রতিপক্ষ হবে বিজেপি। কারণ সেই ভোটে সিপিএম বা কংগ্রেসের কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না। সরাসরি মমতা বনাম মোদী হবে সেই ভোট। প্রশ্ন হলো, মাত্র তিনটি আসন পেয়ে এই এতটা আশার কারণ কি? বিজেপির এক নেতার বক্তব্য, হুবহু অসমের মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে পশ্চিমবঙ্গে। অসমে ২০১১ সালে মাত্র পাঁচটি আসন পেয়েছিল বিজেপি। এবারে ১২৬ আসনের অসমে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি। বিজেপিতে আসার প্রবণতার কারণ প্রধানত দুটো। এক, সিপিএম কংগ্রেসকে দিয়ে যে আর মমতাকে সরানো যাবে না তা এবার সকলেই বুঝে গিয়েছেন। আর দুই হলো— তৃণমূল যদি জেলায় জেলায় সন্ত্রাস করে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা পাওয়া যাবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কিংবা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনেক বেশি সরব হবে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুসলমান প্রতিনিধি

পার্টি	২০১৬	২০১১	২০০৬
বিজেপি	০	০	০
সিপিআই	—	—	—
সিপিআইএম	৮	এলএফ ১৮	এলএফ ৩৪
তৃণমূল কংগ্রেস	৩৩	২৭	৪
জাতীয় কংগ্রেস	১৭	১৪	৭
ফরোয়ার্ড ব্লক	১	—	—
আর এস পি	০	০	০
গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা	০	০	০
নির্দল	০	১	০
মোট	৫৯	৬০	৪৫

সৌজন্যে : গ্রাফিক্স : বেঙ্গল স্পটলাইট

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ডাক দেওয়াতেই জয়ী দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় এবার সবচেয়ে বড় চমক খড়্গপুর সদরে। এই কেন্দ্রে দশবারের বিধায়ক কংগ্রেসের জ্ঞান সিং সোহন পালকে ৬ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। জয়ের খবর সামনে আসতেই খড়্গপুর পুরসভার জলের গাড়ির উপর উঠে দাঁড়িয়ে তিনি কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। বলেন, 'আমি জিততে এসেছি। চাচাকে হারাতে আসিনি।' বিজেপি রাজ্য সভাপতির কথা— ‘‘আমাদের পায়ের তলার মাটি ভবিষ্যতে আরও শক্ত হবে। আমরা যে আসতে পারি, সেকথা প্রমাণ হয়ে গেল। এটা আরও মজবুত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।’’

৯২ বছর বয়সী খড়্গপুর শহরের 'মিথ' চাচা জ্ঞান সিং সোহনপালকে দিলীপ ঘোষ হারিয়েছেন ৬ হাজার ৩০৯ ভোটে। দিলীপবাবু পেয়েছেন ৬১ হাজার ৪৪৬ ভোট আর শ্রী সিং পেয়েছেন ৫৫ হাজার ১৩৭ ভোট। তৃণমূল প্রার্থী রমাপ্রসাদ তেওয়ারি ৩৪ হাজার ৮৬ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে চলে গিয়েছেন। উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সাল থেকে এই কেন্দ্রে জয়ী হয়ে আসছেন শ্রী সিং। মাঝে ১৯৭৭ সালে একবার পরাজিত হয়েছিলেন।

খড়্গপুর পুরসভায় যে সন্ত্রাস হয়েছিল তার বদলা নেবার ডাক দিয়েছিলেন দিলীপবাবু। এই রেল শহরে 'বাহুবলী' শ্রীনিবাস ওরফে শ্রীনু নাইডুর বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে দিলীপ ঘোষের সাহস খড়্গপুরবাসীকে আকৃষ্ট করে। গত পুরসভা নির্বাচনে এই খড়্গপুরেই বিজেপির টিকিটেই জয়ী হন শ্রীনু নাইডুর স্ত্রী। জেতার পরই দল বদল করে চলে যান তৃণমূলে। এই বিশ্বাসঘাতকতারই জবাব নেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন দিলীপবাবু। শহরের মানুষ তাঁর সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন। খড়্গপুর শহরের উন্নয়নই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর জয়ের পিছনে রেল এলাকার ভোট অনেকটা কাজ করেছে বলে স্থানীয় ওয়াকিবহাল মহল মনে করছেন। মাফিয়ারাজ ঘোচানোর উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি তিনি রেলের জমি সংক্রান্ত জট কাটিয়ে উন্নয়ন এগোনোর চেষ্টা করবেন বলে জানান।

মাদারিহাটে ফুটলো পদ্ম থমকে গেলো মমতা ঝড়

সাধনকুমার পাল॥ বিজেপি প্রার্থী মনোজ টিগ্গা ২২০৩৮ ভোটে তৃণমূল প্রার্থী পদম লামাকে হারিয়ে চা বাগানবেষ্টিত মাদারিহাট বিধানসভা আসনে মমতা হাওয়াকে রুখে দিলেন। পাশাপাশি মাত্র ১৫১১টি ভোটের ব্যবধানে কালচিনি আসনে বিজেপি প্রার্থী বিশাল লামা পরাজিত হয়েও উত্তরবঙ্গের রাজনীতির ইতিহাসে নজির গড়লেন। কালচিনি আসনের পরাজয় অপ্রত্যাশিত। কারণ দুটি আসনেই নির্বাচনের দু'মাস আগে থেকেই বিজেপি কর্মীদের পাশাপাশি সঙ্ঘের জাগরণ বিভাগের কার্যকর্তা ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে দিন রাত এক করে জনজাগরণের কাজ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি বুথেই বুথ ভিত্তিক টিম তৈরি করে ভোটারের কাছে নিজের মূল্যবান ভোটটি দিয়ে হিন্দুস্বার্থে, দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী শক্তিকে জেতানোর আহ্বান করা হয়েছিল। ক্ষমতাসীন দল তৃণমূলের দেখে নেওয়ার হুমকি ও অর্থবলের কাছে শেষ পর্যন্ত কালচিনি হার মানলেও মাদারিহাট মানেনি। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান

মাদারীহাটের ভোটারদের বিজেপিকে জেতানোর ব্যাপারে মরিয়া করে তুলেছিল। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের ও বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের নানা সেবামূলক কর্মসূচির মাধ্যমেও এই বিধানসভার বাগান এলাকার মানুষের সঙ্গে নিবিড় জনসংযোগ তৈরি হয়েছিল।

এতদিন ক্ষমতায় না থেকেও পেশায় স্কুল শিক্ষক মনোজ টিগ্গা-সহ বিজেপির কার্যকর্তারাও বছরের পর বছর ধরে দুর্দশাগ্রস্ত চা-শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। শ্রী টিগ্গা ২২ বছর ধরে স্থানীয় গেরগেন্ডা চা-বাগান এলাকায় একটি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করার সুবাদে আশেপাশের এলাকাকে হাতের তালুর মতো চেনেন। মৃদুভাষী সদা হাস্যময় মনোজবাবুর দলমত নির্বিশেষে সবার সঙ্গেই সুসম্পর্ক। সঙ্ঘের প্রাথমিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মনোজবাবু দীর্ঘদিন ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে যুক্ত। এর আগে ছ'বার বিজেপির টিকিটে নির্বাচনে লড়াই করে পরাজিত হলেও সমৃদ্ধ হয়েছে অভিজ্ঞতার ঝুলি। মাদারিহাটে অনুষ্ঠিত এক সংবর্ধনার উত্তরে মনোজবাবু বললেন, মানুষের কাছে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন, বিধায়ক হিসেবে যতটুকু করা যায় তার সবটুকু দিয়ে মাদারিহাটের উন্নয়নের জন্য একশো ভাগ প্রয়াস করবেন।

সংবাদ প্রতিবেদন

বৈষ্ণবনগরে জয়লাভ হিন্দুত্বের জয় হিসেবে দেখছেন স্বাধীন সরকার

তরুণ কুমার পণ্ডিত॥ স্বাধীনতার পর এই প্রথম মালদাতে বিজেপি একটি আসনে জয়লাভ করে নজির সৃষ্টি করল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর প্রচেষ্টায় মালদা জেলা ভারতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর মালদার ইংলিশ বাজার কেন্দ্র থেকে জনসঙ্ঘের প্রদীপ চিহ্ন নিয়ে হরিপ্রসন্ন মিশ্র ভোটে দাঁড়াতেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জনসঙ্ঘ— বর্তমানে বিজেপির টিকিটে মালদার বৈষ্ণবনগর কেন্দ্র থেকে স্বাধীন সরকার সিপিএম এবং কংগ্রেসের জোট প্রার্থী আজিজুল হককে পরাজিত করে সকলকে চমকে দিয়েছেন। ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটে এই কেন্দ্রে বিজেপি মাত্র ৫৩৬ ভোটে পিছিয়ে ছিল। গত ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে স্বাধীন সরকার পেয়েছিলেন মাত্র ২০৪৮৩টি ভোট। এবার পেয়েছেন ৭০১৮২টি ভোট। মালদা জেলার এই সীমান্তবর্তী কেন্দ্র বৈষ্ণবনগর জালনোট, আফিম চাষ ও

গো-পাচারের জন্য সংবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এর উপর কালিয়াচকে ঘটে যাওয়া জেহাদি হামলায় থানা লুটপাট অগ্নিসংযোগ ও হিন্দুদের বাড়িঘর ভাঙচুর ইত্যাদির ফলে পশ্চিমবঙ্গ- সহ সারা ভারতের দৃষ্টি কালিয়াচক লাগোয়া বৈষ্ণবনগরের উপরে পড়ে। এইরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর জয় এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ৪৮ শতাংশ মুসলমান জনসবসতিপূর্ণ এই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী বাছাইয়ের সময় সর্বজনগ্রাহ্য প্রার্থী হিসাবে অকৃতদার স্বাধীন সরকারের নামই প্রথম উঠে এসেছিল।

১৯৮৩ সালে গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্দল সদস্য হিসেবে জিতে রাজনীতিতে হাতেখড়ি হয় স্বাধীন সরকারের। অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত বীরনগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব সামলেছেন। সে সময় তিনি আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরস্কার পেয়েছিলেন। সঙ্ঘের প্রথম বর্ষ শিক্ষণপ্রাপ্ত স্বয়ংসেবক স্বাধীনবাবু হিন্দুদের যে-কোনো বিপদে ছুটে গেছেন। থানা, কোর্ট পঞ্চায়েত, বিডিও অফিস সব জায়গাতেই তাঁকে পাওয়া যায়। ১৯৯০ সালে অযোধ্যায় করসেবায় অংশগ্রহণ করেন। ৫৬ বছর বয়সী স্বাধীন সরকার এই জয়কে হিন্দুত্বের জয় বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে তাঁর এই জয় খুব সহজ ছিল না। একদিকে শাসক দলের হিন্দু প্রার্থী, অন্যদিকে কংগ্রেস ও সিপিএম জোটের মুসলমান প্রার্থী। জনজাগরণ সমিতি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সাধুসন্তর দল পরিকল্পনা করে আগে থেকেই প্রতিটি অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ গড়ে তুলেছিল। কালিয়াচকের ঘটনা হিন্দুদের চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়েছিল। আশা করা যায় এই জয় সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবে এবং এই সীমান্তবর্তী এলাকায় হিন্দুদের মাথা তুলে দাঁড়াবার পথ দেখাবে।

অসমে অতুল বরার রেকর্ড ভোটে জয়লাভ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অসমের দিসপুর কেন্দ্রের অগপ প্রার্থী অতুল বরা ১,৩০,১৯৭ ভোটের ব্যবধানে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের অকন বরাকে পরাজিত করেছেন। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সবাইকে উড়িয়ে দিলেও এত বড়ো ব্যবধানে কেউ জেতেনি। এটা একটা সর্বকালীন রেকর্ড। যদিও গত বুধবারেই তাঁর লক্ষাধিক ভোটে জেতার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন অতুল। ফল ঘোষণার পর তিনি বলেন, 'অকন বেরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বারবার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি দিসপুরের মানুষকে প্রতারিত করেছেন। আমি জানতাম মানুষ আর তাকে ভোট দেবেন না।' অন্যদিকে, বরাক উপত্যকার বড়খোলা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী কিশোরনাথ জিতেছেন সব থেকে কম

ভোটে।

নির্দল প্রার্থী মিসবাহুল ইসলাম লস্করকে তিনি হারিয়েছেন মাত্র ৪২ ভোটে।

হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদত্যাগী এস এফ আই নেতা রোহিত ভেমুলা সম্পর্কে বিস্ফোরক তথ্য দিলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (এসএফআই) জেনারেল সেক্রেটারি রাজু কুমার সাহু ইউনিয়নের পদ ছাড়ার পর এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, মৃত মেধাবী গবেষক রোহিত ভেমুলা যে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করে গিয়েছিলেন তা থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে পাঁচ-পাঁচটি লাইন ছেঁটে ফেলা হয়েছে। সাহু বলেন, এই অংশটিতে মূলত ছিল এসএফআই-এর সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সমালোচনা ও আম্বেদকর ছাত্র সংগঠন (এএসএ) সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য। এই প্রসঙ্গে তিনি সিবিআই তদন্ত দাবি করেন।

একটি বিশিষ্ট ইংরেজী দৈনিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শ্রীসাহু বলেন, 'এই সব সংগঠন এএসএ, এসএফআই বা এই গোত্রের যা কিছু সবই তাদের নিজের নিজের ধান্দার জন্যই টিকে থাকতে চায়। অথচ ভাবটা দেখায় এরা যেন প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে এসেছে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ক্ষমতা কুক্ষিগত করা, বিখ্যাত হয়ে ওঠা। সাহু আরও বলেন, 'এসএফআই এবং এএসএ উভয়েই ভেমুলাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে— যতদিন সে জীবিত ছিল'। আর এখন মারা যাবার পরও তারা তাকে ছাড়তে চাইছে না।

উবাচ

"সিপিএমের বোঝা দরকার বিজেপি এখন দেশ শাসন করছে এবং দেশের ১৪টি রাজ্যও। কেরলেও বিজেপির ভোটারদের সমর্থন বেশ ভালই। তাই সন্ত্রাসের হানাহানি এখনই বন্ধ করতে হবে।"

রবি শঙ্কর প্রসাদ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

কেরলে বিজেপিকর্মীদের হত্যার বিরুদ্ধে সিপিএমের প্রতি সতর্ক বার্তা।

"ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ নয়, বিশেষত নদী এলাকায় যেখান দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটে। আমরা এমনভাবে তা বন্ধ করতে চাই যেখান দিয়ে একজন অনুপ্রবেশকারীও ঢুকতে পারবে না।"

সর্বানন্দ সোনোয়াল
মুখ্যমন্ত্রী, অসম

অসমে বিজেপির জয়লাভের পর।

"বহু মানুষ এই বলে ক্ষোভ প্রকাশ করে যে বহু প্রতিষ্ঠানের নামই একটি পরিবারের লোকেদের নামে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, কংগ্রেসের মধ্যে অনেকেই এতে লজ্জা বোধ করেন।"

ঋষি কাপুর
বলিউড অভিনেতা

"ইরান ও ভারতের পারস্পরিক সহযোগিতার এক বড় প্রতীক হয়ে উঠতে চলেছে ছাবাহার।"

হাসান রৌহানি
ইরানের প্রেসিডেন্ট

ভারত-ইরানের মধ্যে ছাবাহার বন্দর চুক্তির প্রসঙ্গে।

"জাপানে পরমাণু বোমা ফেলা নিয়ে বিশ্লেষণ ঐতিহাসিকদের কাজ। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট আসনে গত সাড়ে সাত বছরের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি যে, প্রত্যেক নেতাকেই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়।"

বারাক ওবামা
প্রেসিডেন্ট, ইউএস

হিরোসিমায় বোমাবর্ষণ প্রসঙ্গে।

হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবোধের প্রতি বাংলার মানুষের মনে আস্থা জাগছে

দক্ষিণবঙ্গে বামেদের মৃত্যুঘণ্টা যেমন বেজেছে তেমনি রাজ্যজুড়ে হিন্দুত্বের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে জাগছে। বিধানসভায় এবার বিজেপির তিনটি আসনে জয় যেমন সত্য, তেমনি রাজ্যের দুই প্রান্তজুড়ে সঙ্ঘের শাখার বিস্তারও সত্য। এবারের বিধানসভার নির্বাচনে এই রাজ্যে বিজেপি সর্বমোট ৫৬ লক্ষ মানুষের ভোট পেয়েছে। মনে রাখতে হবে লোকসভার ভোটে নরেন্দ্র মোদীর জোরালো হাওয়া ছিল। এবার সেই হাওয়ায় ভোট হয়নি। তাই স্বীকার করতেই হবে হিন্দুত্ব ও জাতীয়তাবোধের প্রতি বাংলার মানুষের মনে আস্থা জাগছে ধীরে ধীরে। হিন্দুত্বের সুনামি হয়তো দেখা যায়নি এবারের ভোটে। তবে আগামী পাঁচ বছরে আজকের জোয়ার সুনামি হয়ে ধাক্কা দেবে না এমন কথা বলা যায় না। মনে রাখতে হবে যে, ২৬২টি বিধানসভার আসনে বিজেপি প্রার্থীর ভোট দশ হাজার ছাড়িয়েছে। এটা যথেষ্ট গর্বের কথা। বাম বুদ্ধিজীবী এবং কলমচিদের শত সহস্র কুৎসা ও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হননি বাংলার ৫৬ লক্ষ ভোটদাতা। সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদকেই তাঁরা আঁকড়ে ধরেছেন মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিষ থেকে ভারতমাতাকে রক্ষার জন্য। এ' বড় কম কথা নয়। নির্বাচনে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক দখলের জন্য লজ্জাজনকভাবে দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই তোষণ নীতি অনুসরণ করে। ভারতে হিন্দুদের অনৈক্যের জন্য তারা আজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তাদের তোষণের প্রয়োজন নেই। মুসলমানরা এককাট্টা হয়ে ভোট দেয়। তাই তাদের মন পাওয়াটা বেশি জরুরি রাজনীতির কারবারিদের। রাহুল সিন্‌হা কলকাতার জোড়াসাঁকো কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছেন। কারণ, রাজাবাজার-মেছুয়া এলাকায় বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ভোটাররা এককাট্টা হয়ে বিজেপি প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছে। এমন একজন প্রার্থীকে

গূঢ় পুরুষের কলম

তারা ভোট দিয়েছে যে-প্রার্থীর পরিবারের সদস্য উড়ালপুল ভেঙে পড়ার ঘটনায় অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত। হ্যাঁ, একেই বলে মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক। যে ব্যাঙ্কের চাবি এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁচলে বাঁধা।

এবারের বিধানসভার নির্বাচনে বিজেপি ৬৬টি আসনে প্রায় ৩০ হাজারের কাছাকাছি ভোট পেয়েছে। ৩০ থেকে ৪০ হাজারের মধ্যে ভোট পেয়েছে ১৬টি বিধানসভা আসনে। ছয়টি আসনে বিজেপি প্রার্থীদের ভোট ৪০ থেকে ৫০ হাজারের মধ্যে। আসানসোল উত্তর, বসিরহাট দক্ষিণ, জোড়াসাঁকো, কালচিনি, কুলটি ও নয়াগ্রামে বিজেপি প্রার্থীরা অল্প ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থানে আছে। রাজ্যে সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে তিনজন বিজেপি প্রার্থী এবার বিধানসভায় বিধায়ক আসনে বসবেন। এর আগে ১৯৭২ সালের নির্বাচনে প্রয়াত বিজেপি (জনসঙ্ঘ) নেতা অধ্যাপক হরিপদ ভারতী এবং অধ্যাপক বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী নির্বাচিত হন। দু'জনেই অসাধারণ বাগ্মী নেতা ছিলেন। হরিপদ ভারতী যখন বলতেন তখন বিধানসভায় শাসকদল কংগ্রেস, সিপিআই বিধায়করা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর ভাষণ শুনতেন। তাঁর ভাষার ব্যবহার, বাচনভঙ্গী, কণ্ঠস্বর ছিল শোনার মতোই। আমার সাংবাদিক জীবনে আমি দ্বিতীয় কোনো বিধায়ককে তাঁর বাচিকশৈলীর কাছাকাছি আসতে দেখিনি। হরিপদ ভারতী বলছেন এবং তাঁকে শাসকদলের বিধায়করা বাধা দিচ্ছেন এমন দৃশ্যও দেখিনি।

অতীতে একদা বিধানসভায় হিন্দুত্ববাদী বিধায়ক দু'জন ছিলেন। পরে মাত্র একজন ছিলেন। এবার তিনজন। সংখ্যা দিয়ে বিচার করলে ভুল হবে। তাঁরা রাজ্যের ৫৬ লক্ষ হিন্দুত্ববাদী মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ মমতার মুসলমান তোষণ নীতি ভাল চোখে দেখছেন না। মুখ্যমন্ত্রীর ভবানীপুর আসনে বিজেপি প্রার্থীর বিপুল ভোট পাওয়াটা ভবিষ্যতে তৃণমূল নেত্রীকে চিন্তায় রাখবে। নিঃসন্দেহে অনেকেরই মনের হিন্দুত্বের প্রতিফলন এবার ইভিএমে পড়েছে। সংবাদমাধ্যম সুকৌশলে একটা ধারণা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে অতীতে শাসকদল সিপিএমের হার্মাদদের অত্যাচারে জর্জরিত বহু কংগ্রেস সমর্থক এবং বামফ্রন্টের শরিকদলের বিক্ষুব্ধ সমর্থকরা সম্ভাবনাময় বিরোধী দল হিসাবে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। বিজেপির ৫৬ লক্ষ ভোটকে হিন্দুত্বের উত্থান বলতে নারাজ বাংলার সাংবাদিকরা। যে-কোনো নবোত্থান বা নবজাগরণ ধীর গতিতে হয়। ধীরে ধীরে তার বুনিয়াদ তৈরি হয়। হড়পা বানের মতো হঠাৎ আছড়ে পড়ে না। ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে মোদী ঝড় থাকা সত্ত্বেও এই রাজ্যে বিজেপি প্রার্থীরা ২০০টি বিধানসভা আসনে গড়ে ১০ হাজার ভোট পেয়েছিলেন। এবার ২৬২টি আসনে প্রার্থীরা ১০ হাজারের বেশি ভোট পেয়েছেন। এইভাবে হিন্দুত্বের জয়রথ চলতে থাকলে পাঁচ বছর পরে বাংলার সমস্ত প্রান্তেই কমল ফুল ফুটবে। বাঙালি হিন্দু ভারতীয় হিন্দুর মূল স্রোতে মিশে যাবে।

জনতা ক্ষমা করেছে, তাই এই ক্ষমতা

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
নবান্ন, মন্দিরতলা, হাওড়া

দিদি আপনাকে অভিনন্দন। ২১১ আসন নিয়ে জয়ের পরে কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না। কিন্তু একটা কথা মানতে হবে দিদি, জনতা আপনাকে এবং আপনার দলকে ক্ষমা করেছে।

সারদা থেকে নারদ-কাণ্ড, সিন্ডিকেট থেকে উড়ালপুল-কাণ্ড— অভিযোগ অনেক ছিল। তা নিয়ে মানুষের মধ্যে ক্ষোভও ছিল। কিন্তু দফায় দফায় আপনি সেই অভিযোগের বিরুদ্ধে বদল করেছেন বয়ান। আর তার জেরেই একটু একটু করে কমেছে মানুষের ক্ষোভ। বিভিন্ন ভোটব্যাঙ্কের শতাংশের হিসেব আছে, কিন্তু আপনার কিছু বক্তব্যই এতখানি জয় এনে দিয়েছে—

১। ২৯৪ কেন্দ্রে আমিই প্রার্থী। আমাকে দেখে ভোট দিন, প্রার্থীদের দেখে নয়।

২। দোষ করলে চড় মারুন কিন্তু মুখ ঘুরিয়ে নেবেন না, মুশকিলে পড়ে যাব।

৩। প্রার্থী ঘোষণার পরে হঠাৎ করে একটি বেআইনি কোম্পানিকে এনে এই সব দেখানো হচ্ছে (নারদ-কাণ্ড)। আগে হলে আমি ভেবে দেখতাম। কিন্তু এখন প্রার্থী বদল সম্ভব নয়। সব তদন্ত হচ্ছে, তার পরেই সব বোঝা যাবে।

৪। যদি মনে করেন আমি চোর, ভোট দেবেন না! চাই না! মানুষ না চাইলে থাকব না!

মানুষকে বোকা ভাবার মানুষ আপনি নন। তাই আপনি ভালই জানেন যে, জনতা আপনার কথায় ভুলে যায়নি কোনো কিছু। বরং এটা সত্যি কথা যে আপনাকে শুধু আপনাকে দেখেই সবাই ভোট দিয়েছে। শুধু আপনার জন্যই সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

পাশাপাশি জোটকে মানুষ বিশ্বাসই করেনি। বিজেপি প্রাণ পেয়েছে। তার আসল শক্তি ঠিক যতটুকু, জয় পেয়েছে সেই ততটুকুই। পাশাপাশি রাজ্যের মানুষ বুঝিয়ে দিয়েছে তারকা-খচিত বিজেপি নয়, দিল্লী প্রভাবিত বিজেপি নয়, বাংলার বিজেপিকেই চাইছে মানুষ। তাই একেবারে খাঁটি বিজেপি ভোট ৭ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশ ছাড়িয়েছে। এটা দিদি, আপনার কাছে মোটেই সুখকর নয়।

যাই হোক, এই চিঠি আপনাকে ভবিষ্যতের জন্য ভয় দেখাতে নয়। বরং বর্তমানের জন্য কিছু পরামর্শ দিতে।

ভুলে যাবেন না দিদি, আপনাকে দেখে যে চোরেদের জনতা জিতিয়েছে তাঁদের কিন্তু বিশ্বাস করেনি। সব কৃতিত্বটুকুই আপনার পাওনা। আপনি কেন্দ্রের টাকায় উন্নয়নের অনেক কাজ করেছেন। তার ডিভিডেন্ড পেয়েছেন। তার মানে এটা নয় যে, জনতা বুঝতে পারেনি। আসলে বাম আমলে কেন্দ্রের টাকা এত বেশি নয়ছয় হয়েছে যে, আপনার আমলের নয়ছয়টা ক্ষমার যোগ্য মনে করেছে মানুষ।

আপনি একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন— 'জয় যত বেশি হয়, তত বেশি নরম হতে হয়।' সত্যিই অনুপ্রাণিত হওয়ার মতো কথা। কিন্তু আপনার ভাইয়েরা একটুও নরম হলেন না। দিকে দিকে আগুন জ্বলছে।

২১১ আসন নিয়ে জয়ের পরে আর এটা ভাবা মানায় না যে আপনি শুধু তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী। তাই বিরোধীদলের সমর্থকদের দিকে তাকান। ওঁরা না থাকলে আপনার এই জয়ের কোনো অর্থ থাকত না। গণতন্ত্রের বড় গর্ব বিরোধীরা। তারাই লড়াই করে জেতার সুযোগ দেয়। এমনি জিতে যাওয়ার মধ্যে কোনো শ্লাঘা নেই।

এবার কটা ছোট্ট পরামর্শ। আশা করি নরম মন নিয়ে ভেবে দেখবেন।

১. কেন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলুন। রাজ্যের ভাল হবে।

২. অনুপ্রবেশ বন্ধ করুন। রাজ্যের ভাল হবে।

৩. ধর্মের ভিত্তিতে উন্নয়নকে ভাগ না করে কাজ করুন। আর মুসলমান তোষণ নয়।

৪। দলের চোরেদের আর ক্ষমতায় নয়। সাজা দিন। বন্ধ করুন সিন্ডিকেট রাজ।

৫। আপনার এবার যোগ্য নেতা বেছে নেওয়ার, বেনোজলকে বাদ দেওয়ার, অপরাধীকে সাজা দেওয়ার অনেক সুযোগ মানুষ করে দিয়েছে। জনগণের ক্ষমাকে গুরুত্ব দিয়ে, সম্মান দিয়ে চলুক রাজ্য। চোখ রাঙানি দিয়ে আর নয়।

— **সুন্দর মৌলিক**

সুবিজ্ঞ ছাত্রছাত্রীদের নেতৃত্ব!

ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের মহান ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষালয়ের অভ্যন্তরে আফজল গুরু ও পাকিস্তান নিয়ে জয়ধ্বনি করেছে এবং নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও কাশ্মীরের মুক্তি দাবি করেছে। এতে কেউ কেউ ক্রোধ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। কারণ তাঁদের মতে এইগুলি দেশবিরোধী প্রচার কার্য। তবে সুখের কথা— বহু বিদগ্ধ অধ্যাপক ও সুদক্ষ প্রাবন্ধিক এই বিপ্লবের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন যে, শ্রদ্ধেয় ছাত্রছাত্রীরা সংবিধান প্রদত্ত পবিত্র বাক্ স্বাধীনতারই সদ্ব্যবহার করেছেন— এতে কোনো অন্যায় হয়নি।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুবিজ্ঞ ছাত্রছাত্রীরা কোনো ভুল করেননি— তাঁরা সংবিধান প্রদত্ত অধিকার ভোগ করেছেন এবং সত্যের জয়ধ্বনি তুলেছেন মাত্র।

জে এন ইউ-তে আফজল গুরুর ফাঁসির বিরোধিতা করে ছাত্রদের সভা (ফাইলচিত্র)।

এক মহান নেতা বলেছিলেন, পার্লামেন্ট একটি শুয়োরের খোঁয়াড়। সেই কারণেই আফ্জল গুরু সঙ্গীদের নিয়ে তা ধ্বংস করতে গিয়েছিলেন— তাতে কিছু হঠকারী নিরাপত্তাকর্মী প্রাণ দিয়েছেন নিজেদের দোষেই। গুরুর একটিই ভুল হয়েছিল— নিজের দেশের পার্লামেন্টের উপর আঘাত না হেনে তিনি দিল্লী দিয়েই তাঁর পবিত্র ব্রত শুরু করেছিলেন। আমরা ভ্রান্তিবশত তাঁর ফাঁসি না দিলে তিনি মনে হয় আমাদের ক্ষয়িষ্ণু পার্লামেন্টটি ধ্বংস করে এক মহা বিপ্লব ঘটাতেন। তাঁর মহান স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানানো সকলেরই কর্তব্য।

'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্যেও অন্যায় কিছু নেই। অবশ্য ওই দেশের সঙ্গে আমাদের অনেক দ্বন্দ্ব হয়েছে। ইতিমধ্যে বার তিনেক যুদ্ধও হয়েছে। এক পাক প্রধানমন্ত্রী হাজার বছর যুদ্ধের হুঙ্কারও দিয়েছিলেন। এটাও ঠিক যে, ওই দেশ কয়েকবার হানাদার পাঠিয়েছিল। কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ভারতে এক মহান বিপ্লবে সাহায্য করা। তাছাড়া, আমরা কয়েকশত বছর ধরে বলে আসছি— 'মেরেছ কলসীর কানা, তা বলে কী প্রেম দেব না?' যদি তার কোনো সামান্য ভুল-ভ্রান্তি হয়ও, তার জয়ধ্বনি করাটা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

সুবিজ্ঞ ছাত্রছাত্রীরা নাগাল্যান্ড, মিজোরাম ও কাশ্মীরের আজাদি চেয়েছেন। চীন অরুণাচল দাবি করেছে, সিকিমের ভারতভুক্তিও পছন্দ করেনি। ছাত্রছাত্রীরা এই দুটি রাজ্যের মুক্তির কথা কেন বলেনি, জানি না। তবে দার্জিলিং, শিলং, হাফলং, কার্শিয়াং প্রভৃতি যে চীনের অংশ, তা নাম করলেই বুঝা যায়। এমনকী ক্যানিং, সবং প্রভৃতির মধ্যেও অনুস্বার আছে— মনে হয় এইগুলিও চীনের অংশ। কংসাবতীর দুই তীরও অবিলম্বে চীনকে ফিরিয়ে দেওয়া দরকার।

মনে হয়— সোলেমানপুর, ইসলামপুর, ঘুটিয়ারী শরিফ, মছলন্দপুর প্রভৃতি স্থান পূর্ব পাকিস্তানের (অধুনা বাংলাদেশ) অংশ। এগুলি পাকিস্তানকে ফিরিয়ে দিলে তার সঙ্গে আমাদের শাশ্বত মৈত্রী বন্ধন আরও দৃঢ় হবে বলে মনে হয়।

আমাদের মহান ছাত্রছাত্রীরা বারবার আমাদের পথের সন্ধান দিয়েছেন ঘেরাও, কটূক্তি, উপাচার্য বিতাড়ন প্রভৃতির দ্বারা। বিভিন্ন সময় তাঁরা বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আমাদের সময় যারা পড়ত তাদের মন পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই নিহিত থাকত। কিন্তু এখনকার মহান ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্য বিষয়টা গৌণ, দেশ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব সমস্যার সমাধান করে তাঁরা পাঠ্যপুস্তকে মনোনিবেশ করেন। দেশ ও দশের কল্যাণের জন্য এটিই দরকার।

সুখের কথা—কিছু মহান জননেতা তাঁদের সমাবেশে সশরীরে উপস্থিত হয়ে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। তবে বিপ্লবকে সার্থক করার জন্য তাঁদের আরও সান্নিধ্যের প্রয়োজন। ওই নেতাদের বাইরে না রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ভিজিটিং প্রফেসর' করে দেওয়া যায় কিনা, তা ভেবে দেখা দরকার।

আসল কথা হলো— ছাত্রছাত্রীদের দাবিগুলো মেনে নেওয়া খুবই দরকারি কর্তব্য। দেশ দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার আগে কমিউনিস্ট দল ভারতবর্ষকে ষোলটি বা আরও বেশি অংশে বণ্টন করতে চেয়েছিল। সেদিন তার কথায় কেউ কর্ণপাত করেনি ভ্রান্তির কারণে। এখন যদি ভারতের

ঊনত্রিশটি অঙ্গরাজ্যকে মুক্ত করে দেওয়া যায়, তাহলেই এই বিশালদেশে শান্তি ফিরে আসবে।

এই কাজটি হয়নি বলে ছাত্রছাত্রীরা পড়ায় মন দিতে পারছেন না। মনে ক্ষোভ আছে বলেই তাঁরা ন্যাপ্‌কিন বিপ্লব করেন, অর্ধনগ্ন অবস্থায় একজনের পেটে মাথা রেখে অন্যজন নিশিযাপন করেন, পুলিশ-প্রবেশে বাধা দেন, ক্যান্টিন খোলা রেখে নির্জলা অনশন করেন এবং প্রকাশ্যে পরস্পরকে চুম্বন করেন। এক্ষেত্রে পরীক্ষা-প্রস্তুতিতে অবশ্যই বিঘ্ন ঘটে, কিন্তু তাতে অসুবিধার কিছু নেই— পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া বা অকৃতকার্যদের পাশ করে দেওয়ার জন্য আন্দোলন করা চলে। উপাচার্যদেরও কিছু করণীয় নেই— কারণ তাঁরা তাঁদের বিতাড়িত করতে পারেন। ন্যাড়া ক'বার বেলতলায় যায়?

একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্র ছাত্রছাত্রী নাকি তালা ভেঙে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছেন এবং ভাঙচুর চালিয়েছেন। কিন্তু এগুলি তাঁদেরই সম্পত্তি— সুতরাং তা রক্ষা বা বিনষ্ট করার মৌলিক অধিকার তাঁদের আছে। এই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বা রাষ্ট্রের কিছু বলার নেই।

আমাদের একমাত্র কর্তব্য— এঁদের পথ অনুসরণ করা— তবেই দেশের মঙ্গল।

আরও একটি কাজ জরুরি। এঁদের মধ্যে একজন প্রশ্ন তুলেছেন— 'আমেরিকা জিন্দাবাদ' বললে অন্যায় হয় না, তা হলে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বললে অন্যায় হবে কেন? এই মস্তিষ্কের কোনো তুলনা নেই। এখনই তাঁকে পাকিস্তানের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য করে দেওয়া যায় কী?

এবার কাশ্মীরের বিষয়ে ফিরে আসি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, স্বাধীনতার প্রাক্কালে নাকি দেশীয় রাজ্যগুলিকে বলা হয়েছিল তারা স্বাধীনভাবে থাকতে পারে, আবার তাদের রাজ্য বা নবাব ইচ্ছা করলে 'ইন্সস্ট্রুমেন্ট্ অফ অ্যাকসেশন'-এ স্বাক্ষর দিয়ে ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। হঠাৎ পাকিস্তান কাশ্মীরে হানা দেওয়ায় মহারাজা হরি সিং ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তিনি ভারতে যোগ না দিলে ভারত সরকারের কিছু করণীয় ছিল না। তার ফলে হরি সিং তড়িঘড়ি (২৬.১০.১৯৪৭) পূর্বোক্ত দলিলে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন— তিনি সেই সঙ্গে একটি চিঠি লিখে তাঁর রাজ্যের ভারতভুক্তির কথা জানিয়েছেন। ড. বিদ্যাধর মহাজন (দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া), ড. এ. বি. কেনওয়ানি (ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান্স), দুর্গাদাস বসু (ইনট্রোডাক্‌শন টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া) এ. কে. সেন (ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান্স), ভি. এন. আন্না (ফরেন পলিসি অফ ইন্ডিয়া) প্রমুখ ব্যক্তির গ্রন্থ থেকে আমাদের আগে মনে হয়েছিল যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি একটা বৈধ ব্যাপার। কিন্তু এখন পূর্বোক্ত কৃতী ছাত্রছাত্রীদের স্লোগান থেকে জানা গেল যে, ভারত দখলদার এবং সেইজন্যই কাশ্মীরকে যুক্ত করে চীন এবং পাকিস্তানের মধ্যে বণ্টন করা একান্ত প্রয়োজন।

> **মনে ক্ষোভ আছে বলেই তাঁরা ন্যাপ্‌কিন বিপ্লব করেন, অর্ধনগ্ন অবস্থায় একজনের পেটে মাথা রেখে অন্যজন নিশিযাপন করেন, পুলিশ- প্রবেশে বাধা দেন, ক্যান্টিন খোলা রেখে নির্জলা অনশন করেন এবং প্রকাশ্যে পরস্পরকে চুম্বন করেন।**

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন— 'যতদিন বাঁচি, ততদিন শিখি।' সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে আমাদের তথাকথিত পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও আমৃত্যু শিখতে হবে। শাসক ও জনপ্রতিনিধিদেরও উচিত এদের নিকট থেকে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করা ও তার ভিত্তিতেই বিভিন্ন ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করা। আরও ভালো হয় বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-নেতাদের দেশশাসকের পদে বসিয়ে দেওয়া।

অন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিদুষী বালিকা 'সর্টস্' পরে ক্লাসে আসায় অধ্যাপক তাঁকে তিরস্কৃত করেছিলেন। প্রতিবাদে পরের দিন সকল ছাত্রী ওই বেশে ক্লাসে আসেন। এটাই ঠিক। ছাত্রছাত্রীরা ইচ্ছা করলে নগ্ন হয়েও বিদ্যাস্থানে যেতে পারেন— এটা তাঁদের মৌলিক অধিকার। আমাদের উচিত তাঁদের ইচ্ছা অনুসারে চলা। কেননা তাঁদের কথাই শেষ কথা।

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ /
৯২৩৩১৮৯১৭৯

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর

কমিউনিজমের শোকযাত্রায় শাপমুক্তি বাংলার

অভিমন্যু গুহ

প্রথমেই গৈরিক অভিনন্দন একটি বিশেষ সংবাদগোষ্ঠীকে। 'সিপিএম ক্ষমতায় ফিরছে' এই রব তারা না তুললে বুঝতেই পারা যেত না সিপিএমের ওপর বাংলার মানুষের আরও কত ঘৃণা জমে আছে। গত পাঁচ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বাংলার ভোল বদলে দিয়েছিলেন? বরং সিপিএমের ট্র্যাডিশনই বজায় রেখেছিলেন। বাংলা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে বাংলার মানুষের কিছু যায় আসে না। ফল ঘোষণার

জোটের মুখ— মানস ভুঁইয়া ও সূর্যকান্ত মিশ্র।

দিন 'ভাটের ভারতমাতা' শোনার চাইতে 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' শুনতেই তাঁরা স্বচ্ছন্দ বোধ করেছেন। 'ওরা জীবনের গান গাইতে দেয় না'-র চেয়ে 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ' শুনে খুশি হতে চেয়েছেন। তাই যাদবপুরে কমিউনিজমের জীবাশ্ম সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আবারও অনুভূত হলো। কিন্তু মানুষের রোষের যে বহিঃপ্রকাশ চোখে পড়ল তাতে এদের গতি যে এবার যাদবপুরেও হবে না, সেকথা হলফ করে বলা চলে।

তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করেন, তৃণমূলের এই জয় সম্ভব হয়েছে স্রেফ জাতীয়তাবাদী ভোটের ফলে। গত লোকসভা নির্বাচনে ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল বিজেপি। এবার তা কমে দাঁড়িয়েছে দশ শতাংশের সামান্য কিছু বেশিতে। প্রশ্ন উঠতে পারে, একদিকে যখন জাতীয়তাবিরোধী কর্মকাণ্ডে সারা দেশের সঙ্গে বাংলাও উত্তাল, তখন তো জাতীয়তাবাদী ভোট আরও সুসংহত হওয়ার কথা। এবং এক্ষেত্রে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা বিজেপিরই। কিন্তু ভোট পাটীগণিতের অঙ্ক এত সহজে মেলে না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, জাতীয়তাবাদী ভোটাররা অনেকক্ষেত্রেই দেখেছেন যেসব জায়গায় বিজেপি দুর্বল, জেতার সম্ভাবনা ক্ষীণ, সেখানে ঢেলে তাঁরা তৃণমূলের পক্ষে গিয়েছেন। ঠিক যেমনটি হয়েছিল গত বিধানসভা নির্বাচনে।

তাই গত পাঁচ বছরে দুর্নীতির ইস্যু, অপশাসন, নারীর ওপর অত্যাচার, প্রশাসনহীনতা সব পেছনে চলে গেল। 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি'র কোনো প্রভাবই টের পেল না শাসক দল। গত পাঁচ বছরে সিপিএমের আমলের 'অভিশাপ' ভোলার যেটুকু সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল, এবছরের গোড়ায় জে এন ইউ-য়ে আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অসভ্যতা— বামপন্থীদের বিপদ সম্পর্কে রাজ্যবাসী ক্রমশ সচেতন হচ্ছিলেন। তাই দেশদ্রোহী বাম-কংগ্রেস জোটকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি। আর এক্ষেত্রে হাতের সামনে পেয়েছিলেন তৃণমূলকে, স্রেফ বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে। এই জাতীয়তাবাদী ভোটারদের উভয় সংকটের বিষয়টি আমরাও মানি। একদিকে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত একটি দল, অন্যদিকে দেশবিরোধী কার্যকলাপে মদতদাতা একটি দল--- বেছে নেওয়ার সময় দেশবিরোধিতাই তাঁদের চোখে অধিক গর্হিত বলে মনে হয়েছিল। তাই নেতিবাচক হলেও বিপুল ভোটে জয় তৃণমূলের। এবং ভবিষ্যতে তাঁদেরও দায়িত্ব থাকল জাতীয়তাবাদী মানুষের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার।

আরও একটি প্রশ্ন এখানে উঠবে। সিপিএমের এই হাঁড়ির হালের পাশাপাশি ৪৪টি আসন পেয়ে কংগ্রেসের মুখরক্ষা তবু হলো কীভাবে? বিশেষ করে যখন 'কংগ্রেস-মুক্ত ভারত' গড়ার ডাক দিয়ে গত লোকসভা নির্বাচনেই বিপুল সাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পেয়েছিলেন। উত্তরটা খুঁজতে হলে সেই জোটের দিকেই তাকাতে হবে। জোটটা হয়েছিল কংগ্রেস-সিপিএমের দু'টি অদ্ভুত স্বার্থে। সিপিএমের লক্ষ্য ছিল যেন তেন প্রকারেণ রাজ্যে ক্ষমতা দখল। সিপিএমের নেতা কর্মীরা যারা এককালে বাংলার মানুষের ওপর প্রভূত নির্মম অত্যাচার করেছে এবং জমানা বদলের পর দলবদলের সুযোগ

পায়নি, গত পাঁচ বছরে এদের অবস্থা অনেকটা ভুখা পার্টির মতো ছিল। ক্ষমতায় ফিরতে মরিয়া এদের ভোট কংগ্রেস পেয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে অন্য জায়গায়। এই সিপিএম কর্মীদের হাতে এককালে লাঞ্ছিত হতে হতে আজ হঠাৎ কংগ্রেস কর্মীরা এদের সঙ্গে জোটে যাবেন একথা কংগ্রেস নেতারা ভাবলেন কী করে? আসলে কংগ্রেস নেতারা খুব ভালো করেই জানতেন মালদা, মুর্শিদাবাদ বাদে রাজ্যে তারা আক্ষরিক অর্থেই সাইনবোর্ড। সুতরাং দু-চারজন কংগ্রেস কর্মী ভোটে খাটলেন না ঘরে বসে রইলেন তাতে নেতাদের কিছু এসে যায় না। তাদের দরকার ছিল বিধায়ক হওয়া আর সেক্ষেত্রে সিপিএমের সমর্থন। এবং এই লক্ষ্যে এরা পুরোপরি সফল। যে কারণে আবদুল মান্নান, মানস ভুঁইয়া, অরিন্দম ভট্টাচার্য, শঙ্কর সিংহের মতো কংগ্রেস নেতারা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন আসন থেকে জিতে আসতে পেরেছেন। এবং এটা যে সম্ভব হয়েছে সিপিএমেরই জন্য, লোকসভাওয়াড়ি ফল দেখলেই সেটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু কপাল পুড়ল সিপিএমের। মহম্মদ সেলিমের কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে হয় সিপিএমের ভোট কংগ্রেস পেল, কিন্তু অত্যাচারিত কংগ্রেসীদের ভোট সিপিএমের ভাগ্যে জুটল না। প্রকৃত কংগ্রেসীদের সৌজন্যে সিপিএম দেখল বারবার ঘুঘু হয়ে ধান খাওয়া যায় না, একেক সময় মরতেও হয়। বাংলার সেই সংবাদগোষ্ঠীটি যতই এই কমিউনিস্ট মৃতদেহের ওপর সঞ্জীবনী সুধা ঢালুক না কেন, এদের প্রাণোদ্ধারের আশা আর নেই। সিপিএমের কপালে জুটেছে ২৬টি আসন, সাঙ্গোপাঙ্গদের মিলিয়ে ৩২-এ গিয়ে ঠেকেছে। কংগ্রেস ৪৪টি আসন না পেলেও সিপিএমের কপালে প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা জুটতো না। কারণ এই মর্যাদার অধিকারী হতে গেলে ন্যূনতম ৩০টি আসন এককভাবে পেতে হয়। বাংলায় স্বাধীনতা-পরবর্তী এ এক নতুন সকাল, যেখানে রাজ্য-রাজনীতিতে কমিউনিস্টরা আক্ষরিক অর্থেই অপ্রাসঙ্গিক, যাদের বিরোধী দলের মর্যাদাটুকুও নেই।

> **“জে এন ইউ-য়ে আফজল গুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন থেকে শুরু করে সাম্প্রতিকতম যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অসভ্যতা— বামপন্থীদের বিপদ সম্পর্কে রাজ্যবাসী ক্রমশ সচেতন হচ্ছিলেন। তাই দেশদ্রোহী বাম-কংগ্রেস জোটকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে তাঁরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।”**

মুজফফর আহমেদের দিব্যি, সিপিএম বেঁচে গেল কানহাইয়া কুমার প্রচারে না আসায়। কানহাইয়ার পূর্বসূরীরা ‘বুর্জোয়া’ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল, বেকার-যুবক বিবেকানন্দের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করেছিল, সেই তুলনায় কানহাইয়াদের পাপ বোধহয় খানিক লঘুই হবে। কিন্তু সেই লঘু পাপেই বাংলার মানুষ গতবার কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করার পর, যেভাবে এবারও সপাটে পদাঘাত দিলেন তাতেও কি শিক্ষা হবে না সিপিএমের? নাকি রবীন্দ্রনাথকে ‘বুর্জোয়া কবি’ বলা, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা, বিবেকানন্দকে ‘বেকার যুবক’ বলা— সে যুগে একগুচ্ছ ভুল স্বীকারের পর যাদবপুরও ভুল ছিল’ ‘জে এন ইউ-ও ভুল ছিল’ বলে বালিতে মুখ গুঁজে আরও একবার বাঁচার চেষ্টা করবেন কমরেড?

কংগ্রেসের অবশ্য ভুল স্বীকারের বালাই নেই। জোটে সবচেয়ে লাভবান তারা। সর্বত্র জোট, খালি কংগ্রেস সভাপতি গড়ে ‘বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই’। এবার হয়তো সাধারণ কংগ্রেসীদের ক্ষোভের আঁচ তাদের পেতে হলো না। কিন্তু সিপিএম এভাবে আর কতদিন বাঁচাবে? নরেন্দ্র মোদীর ‘কংগ্রেস-মুক্ত ভারত’-এর আহ্বানের পর রাজ্যে রাজ্যে সোনিয়া-রাহুলের দল এখন পরজীবী (প্যারাসাইট)-তে পরিণত হয়েছে। এরাজ্যে আপাতত একটি কঙ্কালের ন্যায় তাঁরা ‘বেঁচে থাকবেন’। কিন্তু বাংলার মানুষের কৃপায় এদের অন্তর্জলি যাত্রার সময়ও নিকটবর্তী। আর কংগ্রেস-কমিউনিস্ট জোটবন্ধনে দেশে যে অস্থিরতার কালো মেঘ উঠছিল, বাংলার মানুষ একে সমূলে বিনষ্ট করেছেন।

তাই আপাতত ভরসা স্থূল বিজেপিই। তৃণমূলের এই ভরা বাজারেও তাদের ভোটের হার দশ শতাংশ ছাড়িয়েছে। অনুপ্রবেশকারী ভোটপুষ্ট কংগ্রেসের (১২ শতাংশ) থেকে সামান্য কম। এককালে এ রাজ্যের দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসক সিপিএমের ভোটও (২৬ শতাংশের কম) তলানিতে। তাই কংগ্রেস-সিপিএমের অন্তর্জলি যাত্রার পর এদের শ্রাদ্ধের দায়িত্ব বিজেপিরই নেওয়া উচিত, দেশবাসীর স্বার্থেই। সবচেয়ে বড়ো কথা, রাজ্য বিধানসভায় এই প্রথমবার বিজেপি একসঙ্গে তিন সদস্য নিয়ে পা রাখছে।

সুতরাং তাদের কাঁধে এখন বিশাল দায়িত্বের বোঝা। একথা সিপিএম-কংগ্রেসও জানে এবং মানে। তাই গো-হারার পরেও সূর্যকান্ত মিশ্র, অধীর চৌধুরীরা ‘সাম্প্রদায়িকতা’র জিগির তুলেছেন। অনেকে বলছেন, লজ্জা না হয় নারীর ভূষণ, কিন্তু এদের কি একটুও থাকতে নেই? ■

রাজ্য বিধানসভায় তিনটি আসন জিতে বড় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল বিজেপি

অম্লানকুসুম ঘোষ

সম্প্রতি ঘোষিত হয়েছে বাংলার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। নির্বাচন হয়েছে কমিশনের নিখুঁত নজরদারিতে। ভোট পড়েছে প্রচুর এবং ফল প্রকাশের পর দেখা গেছে শাসক দল গত লোকসভা নির্বাচনের চেয়ে প্রায় ৬ শতাংশ ভোট বেশি পেয়ে অর্থাৎ ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী

দিলীপ ঘোষ

স্বাধীন সরকার

মনোজ টিগ্গা

হয়েছে ২১১টি আসনে। এ পর্যন্ত পড়ে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অনেকেরই মনে হতে পারে, তাহলে তো ভালই অবস্থা, নিরপেক্ষ নির্বাচনে যখন শাসক দলের এত জয়জয়কার তাহলে নিশ্চয়ই শাসনকার্য ভালই চলছে পশ্চিমবাংলায়, তা নাহলে এত বিপুল জয় কী কারণে? কিন্তু ভুলটা এখানেই, প্রকৃতপক্ষে বাংলার শাসনের বদলে কুশাসন চলছে। অরাজকতা, দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে রাজ্য-প্রশাসনের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। ত্রিফলা থেকে উড়ালপুল প্রতিটি কাজেই দুর্নীতি। তা কোথাও শুধুমাত্র চুরির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকছে, কোথাও আবার বহু মানুষের মৃত্যুর কারণও হচ্ছে। বেআইনি চিটফান্ডে সর্বস্বান্ত হচ্ছে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ, আর সেই চিটফান্ডে মদত জুগিয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা। সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে চলা তদন্তে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হওয়া মন্ত্রী জেল-হাসপাতাল কুমির-ডাঙ্গা খেলেই মন্ত্রিত্ব চালিয়েছেন দিনের পর দিন। সরকারি পরিষেবার অবস্থাও তথৈবচ। মানুষের হাসপাতালে কুকুরের ডায়ালিসিস (হোক না কুকুর, নেতার কুকুর তো!), বিদ্যালয়গুলি দিনের পর দিন বন্ধ (অনেক সময়ে শাসক দলের মিছিলে হাঁটার জন্য), সরকারি চাকরির পরীক্ষা কয়েকবছর পর একবার অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে থাকে মাত্রাছাড়া দুর্নীতি, শিল্পক্ষেত্র শ্মশানে পরিণত, সরকারি চাকরিতে ডিএ বন্ধ কিন্তু শাসক দলের মদতপুষ্ট ক্লাবগুলি কোটি কোটি টাকার অনুদান পুষ্ট, বেআইনি চোলাই খেয়ে মারা গেলে ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ, মসজিদের ইমামদের মাসে মাসে মাসোহারা (যদিও আদালতের হস্তক্ষেপে বন্ধ), অরাজকতার তালিকা রাজ্যে ক্রমবর্ধমান।

শুধু দুর্নীতি বা অরাজকতাই নয়, দেশদ্রোহী শক্তিকে উৎসাহ দেওয়ায় রাজ্যে ও রাজ্যের শাসকের ক্লান্তি নেই। এ রাজ্যের শাসক দলের এক রাজ্যসভার সদস্যের নিষিদ্ধ উগ্রপন্থী কার্যকলাপকে ঢাকা দিতে চায় রাজ্যের সরকার। সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তো প্রকাশ্য জনসভায় বলেন, বাংলাদেশ থেকে যত লোক আসুক তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে (তার ফলে এক কোটি বেকারের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বেকার যুবক-যুবতীদের অবস্থা যত খারাপই হোক)।

অনভিজ্ঞ পাঠকের বিস্ময়ের পারদ এখানে আরেকটু চড়বে। তাহলে এরকম একটি দলকে কেন পুনর্নির্বাচিত করল রাজ্যবাসী। অবাধ গণতন্ত্রে তো এরকম ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দলকেই পরবর্তী শাসক হিসেবে বেছে নেয় জনগণ, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হলো কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেও লুকিয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচিত যে জোট (সিপিএম-কংগ্রেস) তারা অপকর্মের তালিকায় যেন শাসক দল তৃণমূলকেও টেক্কা দেয়। সিপিএম শাসিত ৩৪ বছরে মুখ্যমন্ত্রীপুত্র কোনো এক অখ্যাত সংস্থায় কেরানির কাজ করতে করতে কোটিপতি শিল্পপতি হয়েছিলেন। স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ, সবই নির্ধারিত হোত পার্টি অফিসের অঙ্গুলি হেলনে। আর এক জোটসঙ্গী কংগ্রেসের জমানায় বিখ্যাত এমার্জেন্সির সময়কার অত্যাচার তো আজও জনমানসে আতঙ্ক ছড়ায়। যে আতঙ্ক এতটাই ভয়াবহ যে তার জুজু দেখিয়েই পরের শাসকরা তাদের আমলের মরিচঝাঁপি, বিজন সেতু, ধানতলা, বানতলা, সব অত্যাচারের ঘটনা ধামাচাপা দিয়েছিল।

আর দেশদ্রোহিতার প্রসঙ্গ, 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' থেকে শুরু করে চীন-ভারত যুদ্ধে চীনকে সমর্থন করা, বামপন্থীদের রক্তেই তো দেশদ্রোহিতা! তবে এতদিন দেশদ্রোহিতা হোত মুখোশের আড়ালে আর এখন সেই মুখোশও খুলে গেছে। প্রকাশ্যেই বামপন্থী নেতারা দেশকে

মা বলতে অস্বীকার করছেন। দেশের সংসদ আক্রমণকারীকে সমর্থন করছেন। তাদের জোটসঙ্গী কংগ্রেসও একই রকমভাবে নিজেদের দেশদ্রোহিতার মুখোশ (জওহরলাল নেহরুর সময় থেকে ভারতের বদলে চীন বা রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বেশি সুবিধা দেওয়া) খুলে রেখে প্রকাশ্যে দেশদ্রোহিতা শুরু করেছে উপরোক্ত বিষয়ে বামপন্থীদের সমর্থন করে।

এ হেন 'কীর্তিমান' প্রধান বিরোধী জোট-কে কেনই বা জনসাধারণ পুনরায় ক্ষমতায় আনবে? তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে কেইবা স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিতে চায়। ডাঙায় বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতে জলের কুমিরের ব্যাদিত মুখগহ্বরে আত্মসমর্পণ করে কোন্ আহাম্মক? তাই প্রধান বিরোধী জোটের প্রধানতম গায়েন সিপিএমের ভাগ্যে জোটে মাত্র ২৬টি আসন (গতবারের ৪০টির তুলনায় ১৪টি কম) আর ভোটের শতাংশ গতবারের চল্লিশ থেকে প্রায় অর্ধেক হয়ে দাঁড়ায় মাত্র পঁচিশে। এমনকী ২০১৪ লোকসভা ভোটে সারা দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সময়েও যারা পশ্চিমবঙ্গে তিরিশ শতাংশ ভোট পেয়েছিল তাদের এবারে মাত্র ২৫ শতাংশ ভোট পাওয়া (দেশ) মাতৃদ্রোহিতারই ঈশ্বরপ্রদত্ত শাস্তি বলে মনে হয়। জোটের বায়েন কংগ্রেসের অবস্থা মন্দের ভাল। সুবিধাবাদী রাজনীতি করে গতবারের মতোই আসন (৪৪টি) পেয়েছে তারা; ভোটের হারও গত লোকসভা (২০১৪) ও গত বিধানসভা (২০১১)-র থেকে বাড়িয়ে ১২ শতাংশে নিয়ে গেছে। জোটের বাকি লেজটুকুর কথা না বলাই ভাল— সিপিআই (১), ফরওয়ার্ড ব্লক (২), আর এস পি (৩) প্রভৃতির ভোট শতাংশ ১ থেকে ২-এর মধ্যে।

এটাই বাংলার গণতন্ত্রের হতাশার প্রধান কারণ। শুধু নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থাই গণতন্ত্রের উদ্ধারকর্তা হতে পারে না। এমন রাজনৈতিক দলও দরকার যারা রাজ্যকে নতুন দিশা দেখাতে পারে। দুর্ভাগ্য বাংলার, শাসক বা বিরোধীদের মধ্যে তারা তেমন

বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে একমাত্র জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি আজ ক্রমবর্ধমান। গত বিধানসভা নির্বাচনে (২০১১) মাত্র চার শতাংশ ভোট পাওয়া বিজেপি এবার ১০.২ শতাংশ ভোট পেয়েছে একক শক্তিতে।

কাউকে পেল না, তাই শুধুই হতাশায় তারা ঋণাত্মক ভোটেরই (অর্থাৎ কেউ ভাল নয় কিন্তু কে কম খারাপ) শরণাপন্ন হলো। তারই ফলশ্রুতি আজ শাসকের জয়জয়কার। বাংলা জুড়ে আজ রাজনৈতিক তরজায় কোনো সদর্থক কথা নেই। যাবতীয় অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগকে এক কথায় বিশ্লেষণ করা যায়, 'আমরা তোদের চেয়ে কম চোর'। রাজ্য জুড়ে প্রায় ১২ লক্ষ মানুষের নোটায় ভোটদান এই বিপর্যয়কারী অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু ঘনতমসাবৃত রাত্রির মধ্যেও থাকে পরবর্তী প্রভাতের আশা, তিমিরমেঘাবৃত আকাশেও থাকে ক্ষণপ্রভার প্রভা। বর্তমান বাংলার ভাগ্যাকাশে কি সেটুকুও নেই?

না, তা আছে। বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে একমাত্র জাতীয়তাবাদী দল বিজেপি আজ ক্রমে শক্তি হিসেবে ক্রমবর্ধমান। গত বিধানসভা নির্বাচনে (২০১১) মাত্র চার শতাংশ ভোট পাওয়া বিজেপি এবার ১০.২ শতাংশ ভোট পেয়েছে একক শক্তিতে। তিনটি আসন জিতেছে, যা তাদের আসন সংখ্যাকে বাড়িয়েছে ৩০০ শতাংশ। খড়্গপুর সদরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ প্রথমবার নির্বাচনে লড়ে হারিয়েছেন সেখানকার এযাবৎ অপরাজেয় কংগ্রেস বিধায়ক জ্ঞান সিংহ সোহন পালকে। 'জায়ান্ট কিলার' হিসেবে সদ্যখ্যাত হওয়া দিলীপবাবু ছাড়াও মালদার মৌলবাদী শক্তি কর্তৃক বারংবার আক্রান্ত বৈষ্ণবনগরে স্বাধীন সরকার এবং মাদারিহাটে মনোজ টিগ্গা জয়লাভ করেছেন। এছাড়া আরও একশো আসনে বিজেপি বর্তমানে নির্ণায়ক শক্তি। যে একশো আসন সরকার গড়তে এবং ফেলতে সক্ষম। বসিরহাটে শমীকবাবুর পরাজয় এবং ২০১৪ লোকসভার তুলনায় ভোটের শতাংশ কমা (সেবারে ১৭ শতাংশ ভোট বিজেপি পেয়েছিল) দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা বলতে হবে কোনোরকম পরিকল্পিত নিয়মিত আন্দোলন, নিখুঁত প্রচার ও সুগঠিত বৌদ্ধিক সংগঠন না থাকা সত্ত্বেও যে বিজেপি এতটা সাফল্য এ রাজ্যে পেয়েছে তা এটাই প্রমাণ করে যে এ রাজ্যে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ক্ষমতায় দেখতে কতটা আগ্রহী সাধারণ মানুষ, শুধু রাজ্য বিজেপিকে নিজেদের একটু পুনর্গঠিত করতে হবে। তাহলে পরের নির্বাচনে কিন্তু এ রাজ্যে বিজেপিরই ক্ষমতাসীন হওয়ার সম্ভাবনা ১০০ শতাংশ। তা যে সম্ভব তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া গেছে পাশের রাজ্য অসমে।

শেষে শুধু এ কথাই বলা যায়, গত পাঁচ বছরে মন্ত্রীসভার সদস্য হিসেবে যাদের আচরণ রাজ্যবাসীকে কষ্ট দিয়েছে সবচেয়ে বেশি সেই মদন মিত্র, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, সাবিত্রী মিত্র, আব্দুল করিম চৌধুরী, কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, শঙ্কর চক্রবর্তী ও শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতো মন্ত্রীরা এবার তৃণমূলের ভরা বাজারেও পরাজিত; গণতন্ত্রের মহোৎসবে জনগণ তাদের ক্ষমা করেনি। আর দলনেত্রীর মহান 'লালুজী'র সঙ্গে জোট গঠনে (বিহার) বিরক্ত হয়ে উপেন বিশ্বাসকে খালি হাতে ফিরিয়েছে বাংলার জনগণ। ■

অসমে অনুপ্রবেশ বন্ধই সর্বানন্দের প্রথম কাজ

সন্দীপ চক্রবর্তী ॥ অসমের বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভের পর কংগ্রেস মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে বিজেপি বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেল। এই মুহূর্তে দেশের ৬৯ শতাংশ অঞ্চল বিজেপি এবং তার জোটসঙ্গীদের শাসনাধীন। কংগ্রেস রয়েছে মাত্র ১৪ শতাংশ অঞ্চলে। পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, 'বিজেপি এখন প্রকৃত অর্থেই জাতীয় দল। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কামরূপ থেকে কচ্ছ— সর্বত্র বিজেপি।' অন্যদিকে অসমের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেছেন, 'সরকার গঠন করার পর আমাদের প্রথম কাজই হবে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। আমরা খুব দ্রুত বৈধ নাগরিকদের নাম নথিভুক্তিকরণের কাজ সেরে ফেলতে চাই।'

২০১১-র নির্বাচনে অসমে বিজেপি জোট পেয়েছিল ২৭টি আসন। এর মধ্যে বিজেপির মাত্র ৫টি। কংগ্রেস পেয়েছিল ৭৮টি আসন। এবার কংগ্রেসের ঝুলিতে এসেছে মাত্র ২৬টি আসন। অন্যদিকে অতিরিক্ত ৫৯টি আসনে জিতে বিজেপি জোটের মোট আসন সংখ্যা ৮৬টি। এছাড়া এ আই ইউ ডি এফ পেয়েছে ১৩টি আসন ও অন্যান্য ১টি আসন। প্রাপ্ত ভোটের শতাংশের হিসেবেও বিজেপি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছে। কংগ্রেস যেখানে পেয়েছে ৩১ শতাংশ ভোট, সেখানে বিজেপির প্রাপ্তি ৪২ শতাংশ। এবারে অসমে প্রথম দফায় ৬৫টি আসনে এবং দ্বিতীয় দফায় ৬১টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়। প্রথম দফার ভোটে ৭৩ শতাংশ (৪৮টি) আসন বিজেপি জোট দখল করেছে আর দ্বিতীয় দফার ভোটে ৬২ শতাংশ (৩৮টি) আসন। এর থেকে বোঝা যায় কংগ্রেসকে

সরিয়ে বিজেপি জোটকে ক্ষমতায় আনতে অসমের মানুষ কতটা হন্যে হয়ে উঠেছিলেন।

জয়ের কারিগর বিজেপির সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব বলেছেন, 'কংগ্রেস আমাদের জাতীয়স্তরের ইস্যুগুলিতে আটকে রাখার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আমরা মুহূর্তের জন্যেও স্থানীয় ইস্যু থেকে চোখ সরাইনি। আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হলো রাজ্যের উন্নয়ন, অসমিয়া পরিচিতি এবং বেআইনি অনুপ্রবেশের মতো বিষয়গুলি।' শ্রীমাধব জয়ের যাবতীয় কৃতিত্ব রাজ্যের নেতাদের দিয়ে বলেন, 'আমাদের সাংসদরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন'। তিনি বলেন, বিজেপি অসমে অসাধারণ জোটসঙ্গী পেয়েছে। যারা খুব শীঘ্রই এক শক্তিশালী সরকার গঠন করবে। সেই সঙ্গে তিনি ভাবী মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং হিমন্তবিশ্ব শর্মার সাহসী নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্বাভাবিক ভাবেই অসমে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব এখন খুশিতে মাতোয়ারা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মতো তাঁরাও মনে করছেন এবারের নির্বাচনে দল কোনো ভুল করেনি। দেড় দশক ধরে চলা কংগ্রেসী শাসনের একঘেয়েমি, শাসকদলের দুর্নীতি, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে ক্রমবর্ধমান বেআইনি অনুপ্রবেশ এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষ মন খুলে বিজেপিকে ভোট দিয়েছেন। সারা দেশের মতো অসমের মানুষও বুঝে গেছেন যে-কোনো ধর্মীয় বা জাতিগত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়তে হলে বিজেপিই একমাত্র ভরসা। সেই সঙ্গে বিজেপির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আদর্শেও সাড়া দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। বিশ্বাস করেছেন জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে আঞ্চলিক সংস্কৃতির কোনো বিরোধ নেই। স্বকীয়তা বজায় রেখেও সহাবস্থান সম্ভব। রাজ্য নেতৃত্ব আরও মনে করছে, এই জয় দেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বিজেপির পায়ের নীচের জমি শক্ত করল।

এর ফলে সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে জামাত-ই-ইসলামির ভারত- বিরোধী কার্যকলাপ ও চীনের ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অসম ও ভারত সরকার সদর্থক নীতি প্রণয়নে সমর্থ হবে।

অসমে ভোটের ফলাফল এক নজরে

মোট আসন-১২৬

দল	প্রাপ্ত আসন	আসন সংখ্যায় হ্রাস/বৃদ্ধি	ভোটের শতকরা হার
বিজেপি জোট	৮৬	(+ ৫৯)	৪২%
কংগ্রেস জোট	২৬	(– ৫২)	৩১%
এআইইউডিএফ জোট	১৩	(– ৫)	১৩%
অন্যান্য	১		

চিঠিপত্র

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

।।১।।

গত ৬ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে 'বুদ্ধ ইন আ ট্রাফিক জ্যাম' ছবিটি দেখানো হয়। অনুমতি দিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। অন্যথা ওই ছবি দেখানো যেত না। উপাচার্যের রিপোর্টে বলা হয়েছে অনুমতি দেওয়া হয়নি। অথচ এই উপাচার্য সুরঞ্জন দাস বলেছেন যে ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামের দায়িত্ব Alumni Association-এর, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নয়। তাহলে প্রশ্ন হলো যে, এ অডিটোরিয়াম কী বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের বাইরে? যদি তা না হয় তবে উপাচার্যকে এই দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি সত্যি কথা বলছেন না। তাহলে পরে কী করে বন্ধ করা হলো? প্রত্যেক রাজনৈতিক সংগঠনের অধিকার আছে— তাদের নিজ নিজ চিন্তাধারা ব্যক্ত করার। এবিভিপি-র তরফ থেকে যে ছবিটি দেখানো হয়েছে তা বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রাসঙ্গিক। দেশদ্রোহিতার কোনো স্থান বর্তমান ভারতে নেই। যারা আফজল গুরুর ফাঁসির প্রতিবাদে মিছিল ও সভা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। যাদবপুরে বাম ও অতি-বামদের সাইনবোর্ড খুলে ফেলে দিতে হবে। এবিভিপি ও বিজেপি-কে জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে জোরদার আন্দোলনে সামিল হতে হবে। উপাচার্যের পদত্যাগ চাই, কারণ তিনি শুধু বহিরাগতদের দায়ী করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যে এবিভিপি সদস্যদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালালো, তার কোনো উল্লেখ রিপোর্টে নেই। তাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর উৎকর্ষের কেন্দ্র নেই, দেশদ্রোহিতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

—অধ্যাপক আশিস রায়,
বি. গার্ডেন, হাওড়া-৩।

।। ২ ।।

আমরা কি শিক্ষিত হচ্ছি? আমরা কি শিক্ষা গ্রহণ করছি? না আমরা দিন দিন নির্লজ্জ বেহায়া হচ্ছি? না দিন দিন কুশিক্ষিত হচ্ছি? আজকাল কলেজগুলোতে কী শিক্ষা পাচ্ছি? উন্মুক্তভাবে চুমু খাওয়া, অন্তর্বাস পরে ঘোরা। এইগুলো কি প্রতিবাদের ভাষা? ছিঃ ছিঃ! এই জন্য কি বাবা মা আমাদের কলেজে পাঠিয়ে থাকেন? প্রতিবাদের কি আর কোনো ভাষা নেই? আজ মনে হয় আমরা একটু বেশি প্রতিবাদী হয়ে গেছি। এটাকে আপনি আর যাই বলুন প্রতিবাদ বলতে পারেন না।

এটাকে কোনো ভদ্র জাতি প্রতিবাদ বলতে পারে না। কারণ এই প্রতিবাদটা মা বাবা দেখতেও লজ্জা পায়। তাহলে এটা কি প্রতিবাদ? এমন প্রতিবাদ চলতে থাকলে, কাল আমার বোনকে ভাইকে এই শিক্ষার জন্য পাঠাতে চাইবো কি একটু ভেবে দেখবেন?

আর যাই বলি এটাকে শিক্ষা বলতে পারি না। আর কিছু লোক আজ তাদের সাপোর্ট করছে কিন্তু কিসের জন্য। যারা করছে তারা নিজেদের স্বার্থের জন্য করছে।

—সায়ন বিশ্বাস,
রাউতারি, চাকদহ, নদীয়া।

চাই শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম

ভোটে জয়ী হতে হলে শক্তিশালী সংগঠন দরকার। আবার জনসমর্থন না থাকলে সংগঠনও হবে না। এদিকে আবার সমর্থন বাড়াতে বা ধরে রাখতে উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম প্রয়োজন। বাস্তবে পশ্চিম বাংলায় বিজেপির প্রচার মাধ্যম প্রায় নেই বলা চলে।

আনন্দবাজার, বর্তমান, আজকাল, গণশক্তি, এবিপি আনন্দ, ২৪ ঘণ্টা ইত্যাদি সংবাদমাধ্যম নিরন্তর বিজেপির বিরুদ্ধে গেয়েই চলেছে। স্বস্তিকা, বিশ্ব-হিন্দু বার্তা সঙ্ঘ পরিবারের পত্রিকা। এছাড়া জনবার্তা, দৈনিক স্টেটসম্যান, দৈনিক যুগশঙ্খ এগুলিতে বিজেপির ইতিবাচক প্রচার স্থান পায়। কিন্তু এসবের প্রচার সংখ্যা খুবই কম। তাহলে পেট্রোডলারের টাকায় চলা সংবাদমাধ্যমের মোকাবিলা বিজেপি করবে কীভাবে? অর্থাৎ যার ফলে বিজেপির জনসমর্থন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

এই জন্য প্রয়োজন ছোট্ট ২ পৃষ্ঠার পাক্ষিক হ্যান্ডবিল। বিনামূল্যে রাজ্যজুড়ে হাট (সব্জি ও মাছের বাজার), পথচলতি মানুষ, ছাত্র-যুবকদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করবে কর্মীরা। এতে কম খরচে দ্রুত জনসংযোগ বাড়বে।

বিভিন্ন সংখ্যায় (ক) বিজেপির উন্নয়ন, (খ) পশ্চিমবাংলা জুড়ে হিন্দুদের উপর সংগঠিত নানান আক্রমণ, (গ) জে.এন.ইউ, যাদবপুর, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চলা দেশদ্রোহী কার্যকলাপ, শরণার্থী নয়, অনুপ্রবেশের বিপদ। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নিরন্তর ঘটে চলা বর্বরোচিত অত্যাচার, (ঘ) এ রাজ্যে কোথায় সরস্বতী-দুর্গাপূজা বিসর্জনে বাধা, এসব পূজা বন্ধে হুমকি, (ঙ) ঢাক বাজানো, শাঁখবাজানো, উলুধ্বনি, আলপনা দেওয়া এসব বন্ধে ফতোয়া জারি। এগুলি হবে প্রচারের বিষয়বস্তু।

এছাড়া ড. শ্যামাপ্রসাদ, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, ডাঃ হেডগেওয়ার, অটলজী, আদবাণীজী এদের কর্মধারার প্রচার চলুক। দেখুন এক বছরে প্রচারের ফলটা। এছাড়া নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষণা করা হোক এক সন্তানের দরিদ্র পিতামাতার ভাতার ব্যবস্থা। সন্তানের চাকুরির নিশ্চয়তা। দুইয়ের অধিক সন্তানের পিতা-মাতার ভোটাধিকার খর্ব এবং রেশন বন্ধ। গুজরাটের মতো সমাজকে মাদকমুক্ত করা। বিজেপি শাসিত রাজ্যের মতো শিল্পস্থাপন হবে। শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি মুক্ত করে বাংলার গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি। রাজনীতির রং না দেখে অপরাধীদের শাস্তি। পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া।

সর্বোপরি মানুষকে বোঝাতে হবে এ রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে, বিজেপি শাসিত রাজ্যের মতো এরাজ্যেও খুনোখুনি বন্ধ হয়ে শান্তি ফিরে আসবে। যে কারণেই প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রকাশিত হ্যান্ডবিল বিলানোর ফলে অতি সত্বর এ রাজ্যেও বিজেপির জনজাগরণ পরিলক্ষিত হবে। পত্রদ্বারা এ রাজ্যের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে।

—প্রশান্ত কর,
বেলিয়াতোড়, বাঁকুড়া।

কমরেডদের ডাক

রাধাকান্ত মণ্ডল

আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপাকিস্তানের (বাংলাদেশ) থেকে ছিনিয়ে আনা অংশ আর ঘ্যান-ঘ্যানানি হিন্দু হিন্দু বাংলা চাইনে। আমরা চাই কানহাইয়া কুমারের আফজল গুরুর পরাধীন বাংলা। যেখানে থাকবে না বেদের মন্ত্র, গীতার শ্লোক; থাকবে না ভরা গলায় উচ্চারণ করা চণ্ডীমন্ত্র। আমরা চাই মাওসেতুং-য়ের বাংলা, চাই লেনিনের বাংলা, আই-এস-আইয়ের বাংলা। ৬০০ বছরের মোগল শাসন, ২০০ বছর ইংরেজ শাসন এবং ওপার বাংলায় হিন্দুদের ওপর পাকিস্তানিদের শাসন পরাধীনতার অভিলাষকে বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা সঙ্গী পেয়ে গেছি ভারত বিরোধী জিগির দেওয়ার, ইনক্লাব্ জিন্দাবাদের। যারা ভারত স্বাধীন হওয়ার পূর্বে বলেছিল 'পাকিস্তানের দাবি মান্‌তে হবে তবেই ভারত স্বাধীন হবে।' এরা বলে— ভুলে গেলে চলবে না কমরেড, স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয়ে পরাধীনতার মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে হবে। সফলও অনেক অংশে। একটি রেশন কার্ডের বিনিময়ে ওপার থেকে আগত হিন্দুরা শ্যামাপ্রসাদের অবদান ভুলতে বসেছে বিভিন্ন সময় তাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপ্রবেশকারীদের বিতাড়নের সঙ্গে শরণার্থীদের বসবাসের ব্যাপারটিকে ভুল ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন কমরেডরা। এটা ওদের একটি চালও বটে, কারণ পরে বলা হয়েছে আমরা তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি যদি তোমরা আমাদের কথা শোন বা পার্টিতে নাম লেখাও। ঘটনা ঘটেছেও তাই। তাদের আরও শর্ত ছিল যে, ত্যাগ করতে হবে পূজাপার্বণ, যদি করো সেটিও হবে শুধু উৎসব। আমরা তোমাদের সীমান্তে গোরুপাচার, সোনাপাচার, ভারতের সম্পদ পাচারের ব্যবস্থা করে দেব। কমরেড বা বিচ্ছিন্নবাদীদের একমাত্র লক্ষ্য তো ভারতকে আধ্যাত্মিক এবং আর্থিক দিক থেকে দুর্বল করে দেওয়া। এখন অনেকটাই সফল বাংলার যুব সম্প্রদায়কে দুর্বল করার জন্য। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছি— ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত ইংরেজি তুলে দেওয়া, সিলেবাসে বাংলার মনীষীদের ভাল উপদেশ এবং কাজগুলি বাদ দিয়ে, যেটুকু দিলে বাংলাকে না চেনা যায়, সেটি সূক্ষ্ম ভাবে প্রবেশ করানোর কাজ। বাংলার মনীষীদের বিভিন্ন রকম কুরুচিকর বিশেষণের মাধ্যমে তাদের হেয় করার ব্যবস্থা করা, যেমন— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বুর্জোয়া কবি, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে তোজোর কুকুর, বীর সন্ন্যাসী বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দকে ভণ্ড সন্ন্যাসী, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে মৃগী রোগী হিসাবে বিশেষিত করেছে। ৩৪ বছর ধরে সিপিএম আস্তে আস্তে সুকৌশলে প্রতিবাদী মুখগুলো বন্ধ করতে অনেকটা সফল হয়েছে। সম্ভব হয়েছে অনেকটা বাংলার সেই শিল্পশ্রেষ্ঠ তকমা মুছে ফেলতে। বাংলার শিল্পজগৎ এখন শ্মশান ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। (কৃষক ফসল ফলাতে তার ক্ষেতে পর্যাপ্ত সার, কীটনাশক, জলের জন্য হা-হুতাশ করতে বাধ্য হয়েছে।) কৃষক বন্ধুদের বোঝানো হচ্ছে, আমরাই তোমাদের বন্ধু, শ্রমিককে বলা হচ্ছে তোমরা বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করো, কলকারখানায় কাজ বন্ধ করে আন্দোলন করো। ফলে মালিকপক্ষ কলকারখানা বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে, অন্য রাজ্যে কারখানা স্থাপন করছে। শ্রমিক বেকার হচ্ছে তাদের গচ্ছিত অর্থ শেষ হচ্ছে, তাদের এখন আন্দোলনের ক্ষমতা শেষ। দোষ কেন্দ্রের। এসো এখন বাম শ্রমিক সংগঠনে আর বল 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' আমরা মেহনতি মানুষের, বেকার শ্রমিকের পাশে আছি। পরাধীনতার আর এক ধাপ পার করা গেল অতি সূক্ষ্মচালে। তৈরি করা ক্ষুধার্ত মানুষের ভিড় এই বিচ্ছিন্নতাবাদী পার্টির পতাকাতলে। যুব সম্প্রদায়কে অসাধু উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাই বাড়তি কিছু নম্বর দিয়ে হউক বা নকল করার সুযোগ দিয়ে হউক পরীক্ষার খাতায় নম্বর বেশি চাই। অনুশাসনের বিপক্ষে শিক্ষা দিয়ে বলা হচ্ছে— তুমিই প্রথম এবং তুমিই শেষ, মধ্যে ভাল মন্দ বলতে কিছু নেই। ঈশ্বর, ভগবান, আল্লাহ্ বলতে কিছু নেই। ধর্ম আফিম, ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে দেয়, এর থেকে সব সময় দূরে থাকবে। এমন কথা বললে কোন যুবক-যুবতীর ভাল লাগবে না? যাদের কাঁধে সংসার, সমাজের দায়বদ্ধতার ভার পৌঁছায়নি। যৌবন-জীবন উপভোগের জায়গা, উপভোগ করো আনন্দ করো। ভুলে থাক বাহির জগতের চিন্তা। দেখতে দেখতে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার বয়স পেরিয়ে যায়। যুবক-যুবতীদের একটা অংশ পাওয়া গেল। পরাধীনতার আর একটি সিঁড়ি অতিক্রম করা হলো। বলা হলো কাজ কোথায় হবে, কেন্দ্রীয় সরকার সব কলকারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। কেন্দ্র দিচ্ছে না। কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক বিজেপি সরকার। শুনতে খুব ভাল লাগছে বাম/টিএমসি-র কথা। কিন্তু আমার কী হচ্ছে এটি কি একবারও ভেবে দেখেছি। বাংলার যুব সমাজ, কৃষক, শ্রমিক এবং ওপার বাংলা থেকে আগত হিন্দু কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি। বন্ধু, আমরা সিপিএম, আমরা ভারতমাতাকে ভারতমাতা বলি না। বলি ইনক্লাব জিন্দাবাদ। মা বলতে আমাদের শরম হয়। তাতে হিন্দু হিন্দু গন্ধ পাওয়া যায়। হিন্দু নিপাত যাক, কমরেড জিন্দা থাক। আর বেশি দূরে নয়, পরাধীনতা আমাদের দোর গোড়ায়। প্রস্তুত আছেন তো?

দেবর্ষি নারদ

অমিত ঘোষ দস্তিদার

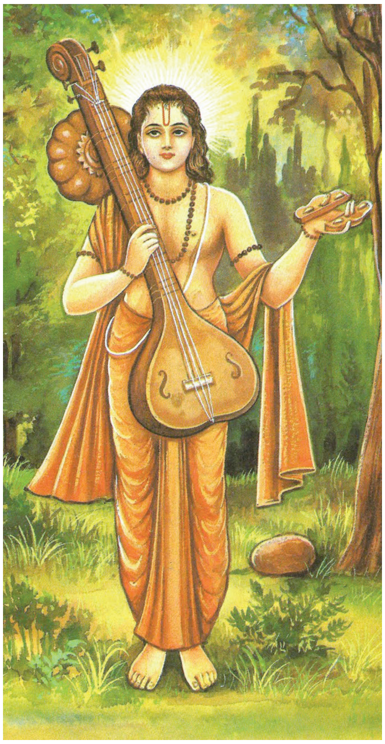

সেই প্রাচীনকাল থেকে রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণের মধ্য দিয়ে পদচারণা করে আজকের এই আধুনিক সময়েও যে মানুষটি (দেবতা-ঋষি-মানব) অখণ্ড ভারতের তথা বিশ্বমানবের মনে বোধ জাগ্রত করেন, সহজ সরল ভাবে বিচরণ করেন, তিনি হলেন নারদ।

গুৎসমত্, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কান্ব, অঙ্গিরস প্রমুখ বিখ্যাত ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উত্তরাধিকার আছে বলে এঁদের কুলমণ্ডল বলা হয়। নারদের কোনো উত্তরাধিকার নেই। যুগ- সময়ে তিনি নিজেই বারবার আবির্ভূত হন। নারদের মর্ত্যলোক থেকে বৈকুণ্ঠলোক পর্যন্ত অবাধ যাতায়াত ছিল। নারদের বীণাও তাঁর চরিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

কৌটিল্য— নিজের 'বিষ্ণুগুপ্ত' নামটির থেকেও মানুষের কাছে নিজেকে কুটিলমতি অর্থাৎ 'কৌটিল্য'-ই বলেছেন। তিনি নারদ সম্পর্কে জানিয়েছেন— নারদীয় রাজনীতি, কূটনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদির গুরুত্ব অসীম। কারণ এই সমস্ত বিষয়ে নারদের ছিল অসাধারণ জ্ঞান।

কাশীরাম দাস তাঁর লেখনী শক্তি প্রতিভার দ্বারা নারদকে সংবাদ প্রেরকরূপে (সমুদ্র-মন্থনের সংবাদ শিবের কাছে) উপস্থাপন করেছেন।

নারদ কৃষ্ণের হাতে পারিজাত ফুল তুলে দিয়ে রুক্মিণী ও সত্যভামার এবং কৃষ্ণ ও ইন্দ্রের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেন। নারদের কাছে কৃষ্ণ সঙ্ঘরাজনীতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

দেবর্ষি নারদ রত্নাকরকে মহর্ষি বাল্মীকি করতে পারেন। বিষাদরত বাল্মীকিকে তিনিই 'রাম'-এর কথা বলতে পারেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত জানাচ্ছে— নারদ ব্রহ্মার দশম মানসপুত্র। অন্যরা হলেন সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু, মরীচি।

স্কন্দপুরাণ জানাচ্ছে— ব্রহ্মা ও শিবের কলহরত ক্রোধরক্ত মুখ থেকে নারদের আবির্ভাব।

স্বামী বেদানন্দ বলেছেন— দেবর্ষি নারদের কৃপায় রত্নাকর- জীবন থেকে— মহর্ষি বাল্মীকিদের আখ্যান মূল বাল্মীকি রামায়ণে নেই, কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে। সিদ্ধিলাভের পর মহর্ষি বাল্মীকি একদা স্বীয় আশ্রমে বসে ভাবছিলেন, জগতে সর্বগুণ সম্পন্ন পুরুষোত্তম কে আছেন? এমন সময় তদীয় দীক্ষাগুরু দেবর্ষি নারদ তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বললেন— "ইক্ষ্বাকুবংশে রাম নামে এক বিখ্যাত রাজা আছেন। তিনি বহু গুণসম্পন্ন, বহু শুভলক্ষণযুক্ত পুরুষোত্তম।"

মহাভারত বিশেষজ্ঞ রাজশেখর বসু জানাচ্ছেন— কশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, পর্বতঋষি প্রমুখ মান্যবর মহান ঋষি সবাই ছিলেন দেবর্ষি নারদের বন্ধু।

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী বলছেন— ভক্তজনের মন-বৃন্দাবনে নারদ নিরন্তর হরিগুণ গান করুন, ইন্দ্রের সভায় তাঁর স্বেচ্ছাকৃত ত্রুটিজনিত বীণাবাদন শুনে তালভঙ্গ হোক নৃত্যরতা সুন্দরী উর্বশীর, সাধারণ মানুষ তাঁর সরল-সহজ মুখ ফসকা কথার টানে কলহ-প্রিয়ই ভাবুক তাঁকে, কিন্তু প্রকৃত নারদ হলেন দার্শনিক এবং রাজনীতির চরম তত্ত্ব-বোদ্ধা। তাঁর নামে আরোপিত আইনের বই এখনও রয়ে গেছে। আমরা যা বুঝি, তাতে নারদের প্রতিভা বহুদিকে। দার্শনিকতা এবং রাষ্ট্রতত্ত্ববোধের সঙ্গে শিল্পীর সূক্ষ্ম-মধুর গুণগুলিও তাঁর মধ্যে থাকায় পরবর্তী পৌরাণিকেরা নিজের প্রয়োজনে তাঁকে যে যেমন পেরেছেন ব্যবহার করেছেন। তাতে নারদের গৌরব কমেনি, বরঞ্চ প্রাজ্ঞতার নিরিখে তাঁর গৌরব আরও বেড়েছে।

যুগ যুগান্তরের সিঁড়িপথে নারদ হেঁটে চলেছেন অখণ্ড ভারতের বুকে বিশ্বনন্দিত হয়ে। বর্তমান দিনে নারদকে যদি তার্কিক বা ঝগড়ুটে আখ্যা দেওয়া হয়, তবে তাঁকে বোধের মাপকাঠিতে মাপলে দেখা যাবে যে তিনি তর্ক বা ঝগড়া বাঁধান এইজন্য যাতে মানুষ প্রতিটি পদক্ষেপের আগুপিছু, পক্ষের এবং বিপক্ষের কার্যকারণ বিশ্লেষণ করতে পারে এবং করতে শেখে। সেই বিশ্লেষণে কিন্তু কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকবে না। ভুলকে ভুল আবার

ঠিককেও ঠিক বলে না মেনে, নিশ্চিন্ত না থেকে, সমস্ত দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। তবেই তার থেকে শিক্ষা নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ তৈরি করা যাবে। স্কন্ধপুরাণ মতে ব্রহ্মা এবং শিবের তর্করত বা কলহরত ক্রোধরক্ত মুখ থেকে নারদের আবির্ভাব। জন্মের উত্তরাধিকার সূত্রে কলহজন্মা নারদের এটাই হলো পৌরাণিক ইতিহাস। মানুষের মধ্যে কলহপ্রবৃত্তি থাকে, আর তারই প্রতীক পুরুষ হলেন নারদ।

খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী বা তারও আগের সুপ্রাচীন গ্রন্থ হলো ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, যা বেদপরবর্তীকালের সুপ্রাচীন গ্রন্থ। এখানে নারদ এমন এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, যাঁর অসীম শক্তিধর শাসকগোষ্ঠীর ওপর খুবই নিয়ন্ত্রণ ছিল। দেবলোক, মর্তলোক সব স্থানেই ছিল তাঁর অবাধ গতি। ইন্দ্রসভা, ব্রহ্মসভা, কুবের সভা ইত্যাদি দেবসভা থেকে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থসভা সবখানেই ছিল তাঁর অবাধ যাতায়াত। রাজা কংসও তাঁকে মান্য করতেন এবং সমঝে চলতেন। প্রাচীনকাল থেকে আজও তিনি কিন্তু অমায়িক, সকলের কাছেই স্বাগত।

পৌরাণিক কথকথায় যেখানে অন্যান্য বিকীর্ণ উপাখ্যানের মধ্যে যোগ পাওয়া কঠিন, সেখানে নারদ সমস্ত উপাখ্যানের মধ্যে যোগসন্ধি ঘটিয়ে দেন। পৌরাণিক এই পদ্ধতিই আরও বিস্তারিতভাবে এবং কখনওবা অতি স্থূলভাবেও ব্যবহার করেছেন প্রাদেশিক কবিরা। সেইভাবে দেখতে গেলে বহুক্ষেত্রেই নারদ পৌরাণিকদের কথা— সহায় এবং পরম আশ্রয়স্থল। নারদ আত্মদানে পৌরাণিকদের বাধিত করে নিজস্ব স্থান স্বকীয়তায় অর্জন করেছেন। নারদ হলেন ভারতবর্ষের মানবসভ্যতার স্বাধীন ধারক, মানুষের কলহ প্রবৃত্তির প্রতীক পুরুষ। ব্রহ্মার কণ্ঠ অংশ-জাত বলে নারদ সুগায়ক। তাঁর বীণার নাম মহতী। বীণায় সবসময় জড়ানো থাকে পারিজাত ফুল। ঢেঁকি বা ঢেঁকিযান ছিল নারদের বাহন। ঢেঁকি দিয়ে ধান ভেঙে চাল হয়। তাই হয়তো ঢেঁকি ছিল নারদের বাহন। কারণ একমাত্র তিনিই সমস্ত যুগের জড়তা ভেঙে আসল নির্যাসটুকু ধান ভেঙে চাল বের করার মতন আজও আমাদের কাছে পরিবেশন করে চলেছেন।

ত্যাগ-বৈরাগ্য-তপস্যার মাধ্যমে সমস্ত দেহাবেশ মুক্ত হয়ে নারদ ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা হতে পেরেছেন। মহাভারতে কৃষ্ণের সঙ্গে নারদ-মুনির এক গভীর আন্তরিক সম্পর্ক দেখা গেছে। বিভিন্ন যুগে নারদের সঙ্গে হনুমানকেও দেখতে পাওয়া যায়। ধ্রুব ও প্রহ্লাদের মতো আরও অনেকের জীবনে নারদ ত্রাতা হয়ে দেখা দিয়েছেন। খৃষ্টীয় ২য়-৩য় শতাব্দীর মধ্যে হরিবংশ-ঠাকুরের কৃষ্ণের বিচিত্র-বর্ণ জীবনের রচনায় নারদকে দেখা যায়। কংস সেখানে নারদকে 'চঞ্চল স্বভাব মুনি' বলে বর্ণনা করেছেন। রাজনীতি, কূটনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ে দক্ষতা; রাষ্ট্রনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে নারদের অসামান্য জ্ঞানছিল— এমনটা কৌটিল্য বুঝেছিলেন। কৌটিল্য নারদের নাম দিয়েছিলেন পিশুন। 'পিশুন' শব্দের অর্থ হলো 'খল', 'কর্ণেজপ'।

বর্তমান দিনের আধুনিক গণতন্ত্রের পূজারিদের কাছে নারদীয়জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি ও শিক্ষণীয়। মহাভারতীয় কৃষিভিত্তিক যুগে ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে নারদ ব্যবসা বাণিজ্যের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি কৃষির সঙ্গে শিল্পের উন্নতির কথাও বলেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন শিল্পী এবং কর্মীদের অর্থনৈতিক অভাব থাকলে শিল্পকাজ ভালো হয় না। জোটরাজনীতি বা সঙ্ঘ রাজনীতির ক্ষেত্রে নারদ বলেছেন— 'এক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে বিভেদই সর্বনাশ ডেকে আনে। সঙ্ঘের সম্মিলিত শক্তি, বুদ্ধি এবং উৎসাহ একত্র হলে সেই সঙ্ঘরাষ্ট্র জয় করা খুবই কঠিন।'

নারদ ইতিহাস-পুরাণ জানেন, পুরাকল্প, পূর্ব-পূর্ব-মন্বন্তরের কাহিনি, কল্প-কল্পান্তরের উপাখ্যান, যে-কোনো দার্শনিক বিষয়ের সঙ্গে কোনটা যুক্ত আর কোনটা যুক্ত নয় তা তিনিই একমাত্র ভালো জানেন। তিনি তর্ক বা ঝগড়া উত্থাপন করতে পারেন, কারণ পক্ষ এবং বিপক্ষের সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সমস্ত রকমের উত্তর তাঁর জানা। সমস্ত দেশের আইন এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তাঁর জানা। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ভাবনা এবং সমাধান ও ভারতবর্ষের 'বিধাতার' মধ্যেও সমন্বয় ঘটাবার ক্ষমতা একমাত্র তিনিই রাখেন। তিনি মেধাবী, পূর্বের কথা, পূর্বের স্মৃতি তিনি ভোলেন না, আবার ভবিষ্যতে যেটা ঘটবে তিনি তার আঁচ পান। বাগ্মী, কারণ যেসব গুণ থাকলে বক্তব্য একেবারে অব্যর্থ হয়ে ওঠে সেই সব গুণই তাঁর মধ্যে আছে।

আমরা আমাদের বোধকে যদি নারদীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারি, সকলের সঙ্গে যদি নারদীয় পথে চলে নারদের মতো অমায়িক হয়ে উঠতে পারি, তবে যে-কোনো প্রচেষ্টা সফল হবে। নারদের মতো আত্মিক প্রচেষ্টা থাকলে আত্মীয়তা গড়ে উঠতে খুব বেশি সময় লাগবে না, কূটনৈতিক পথও সুদৃঢ় হবে। এইভাবে ক্রমান্বয়ে আমাদের সকলের মিলিত নারদীয় প্রচেষ্টা পূর্বের মতো আবার গড়ে তুলতে পারবে সেই অখণ্ডভারত।

(নারদ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত)

পরম্পরা

রাধাতত্ত্ব

রবীন সেনগুপ্ত

রাধাতত্ত্ব ও রাধা ভাবের কোনোটিই কর্মযোগীদের পক্ষে উপযোগী নয়। এটি প্রধানত ভাববাদী ভক্তিযোগীদের জন্যই সংরক্ষিত। তবু এটা স্বীকার করতেই হবে যে রাধাতত্ত্ব ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির একটি সুপরিচিত অঙ্গ। তার সঙ্গে একথাও সত্য যে অনেক কর্মযোগী স্বয়ংসেবকের পরিবারেই রাধাভাবের এক বা একাধিক পৃষ্ঠপোষক আছেন। রাধাভাবের গুরুত্বটি না জানলে ভক্তিযোগীদের সঙ্গে কর্মযোগীদের মতান্তর ও মনান্তর অনিবার্য। কিন্তু এটি বাঞ্ছনীয় নয়। নিজেরা কর্মযোগে ভারতমাতার সেবা করছি বলেই অন্য দেবদেবীর সেবকদের তাচ্ছিল্য করে চটিয়ে দেওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই সংক্ষেপে রাধাতত্ত্বর মূল বিষয়টি অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

রাধাতত্ত্বের মূল আকর গ্রন্থ হলো ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ। এই পুরাণ অনুযায়ী সৃষ্টির আদিতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের সূক্ষ্ম দেহটিকে বিভাজিত করে এক অংশ দ্বারা নিজেরই স্ত্রীরূপ রাধার সৃজন করেন। রাধা-কৃষ্ণ তাই পরস্পরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিবের যেমন অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে বোঝাতে চাওয়া হয় যে যিনি শিব তিনিই দুর্গা— রাধাকৃষ্ণও তদনুরূপ। রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেম তাই মহাপ্রকৃতির সঙ্গে পরমপুরুষের প্রেম। গোপিনীদের সঙ্গে কৃষ্ণের প্রেম হলো ভক্তের সঙ্গে ভগবানের প্রেম, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেম।

কর্মযোগের মাধ্যমে স্বদেশ রক্ষা ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে হলে যথেষ্ট যোগ্যতা ও যথেষ্ট শক্তি সাহস প্রয়োজন। ঝুঁকিও থাকে যথেষ্ট। তাই সবার পক্ষে কর্মযোগ কখনই সম্ভব নয়। তুলনামূলক ভাবে রাধাতত্ত্ব বুঝে নিয়ে প্রেম কীর্তন ও রসলীলায় অংশ নেওয়া ও উক্ত বিষয়ক সাধন ভজন সহজতর। তাই এই ভক্তিযোগেই অধিক সংখ্যক মানুষকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তবে ভক্তি যোগ, রাধাভাব ইত্যাদিতেও বিশেষ ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। সাহিত্য-রস, কাব্য প্রীতি, সঙ্গীত বোধ না থাকলে রাধা ভাবে অংশ নেওয়া যায় না। দেশের বিপদের সময় রাধাভাব কাজে আসে না ঠিকই কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাপনের অবলম্বন হিসাবে রাধাভাব খুবই কার্যকরী— এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। রাধাভাবে ন্যাকামি ও মেয়েলিপনার আধিক্য দেখে কর্মযোগীদের ক্রোধ হয়ে যায় প্রায়শই। কিন্তু তাদের প্রতি রাগ দেখালে অযথা মনোমালিন্য বাড়বে। এতে কর্মযোগীদের জনসমর্থন কমে যেতে পারে। কর্মযোগীদের বুঝতে হবে যে তাদের কাজ যেমন রাধাভাব দিয়ে করা যাবে না, তেমনই রাধাতত্ত্বের সাধকরা অপূর্ব প্রেমময়ী ভাব ও সুললিত ভাষা সহযোগে প্রাণ মাতানো সুর তাল ছন্দ ও নৃত্যের সাহায্যে যত সংখ্যক জনগণকে সহজেই আকৃষ্ট করে আনেন— কর্মযোগ দ্বারা তা সম্ভব নয়। রাধাতত্ত্ব অশিক্ষিত গ্রাম্য বধূ, কৃষক, শ্রমিক— সবাইকে টেনে আনে আসরে। কর্মযোগ কিন্তু বিশিষ্ট মানুষ ছাড়া কাউকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

'রা' মানে মুক্তি আর 'ধা' মানে ধাবমান। রাধা এই নামের মাধ্যমেই অন্তরের দুশ্চিন্তা থেকে অনেকখানি মুক্তি পাওয়া যায়। তাই জনপ্রিয় একটি ভজনে বলা হয়েছে— রাধে রাধে জপ কর, কৃষ্ণ নাম রস পিয়া কর।

শ্রীরাধে বৃষভানুজা, ভক্তানি প্রাণাধার।
বৃন্দাবনবিপিন বিরাহিণী প্রণামং বারংবার।।
জৈসৌ তৈয়সৌ রাওরৌ কৃষ্ণপ্রিয়া সুখধাম।
চরণ শরণ নিজ দিজিয়ে সুন্দর সুখদ ললাম।।

প্রকৃতি পাঠ

নবাঙ্কুর

বাসাভাঙা দোয়েল ছানা

গরমে সবাই হাঁসফাঁস করছে। কবে বৃষ্টি আসবে দিন গুনছিল এই আশায়। গরমের কারণে স্কুলেও ছুটি। পিকাই, রানা, সন্দীপ সবার খুব আনন্দ। বাড়িতে অনেক্ষণ ধরে খেলা যাবে। পুকুরপাড়ে, ডালিমতলায় যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়ানো যাবে। কেউ স্কুলের তাড়া দেব না।

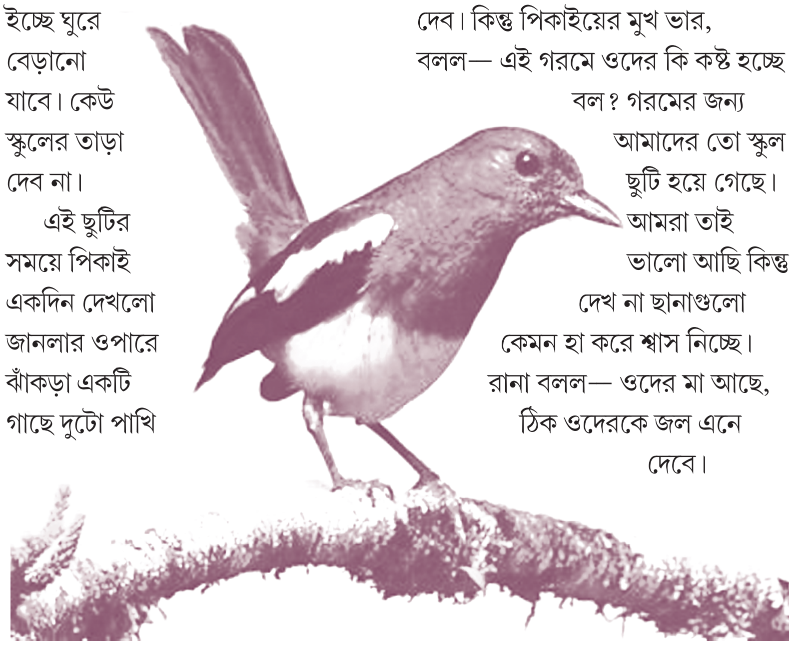

এই ছুটির সময়ে পিকাই একদিন দেখলো জানলার ওপারে ঝাঁকড়া একটি গাছে দুটো পাখি বসে আছে। সাদা কালো দোয়েল পাখি। পিকাই আরো ভালো করে দেখলো সেখানে তাদের সুন্দর একটি বাসা। আর তাতে কতগুলি দোয়েল ছানা। পিকাই গুনলো, পাঁচটি ছানা। আনন্দে লাফিয়ে উঠলো সে। জানলার ধারেই এতো সুন্দর দোয়েলের বাসা, দোয়েল ছানা অথচ আগে দেখেনি! পিকাই দৌড়ে গিয়ে রানা, সন্দীপকে খবর দিল। ছুটে এলো তারা। দোয়েল ছানা দেখে তাদেরও খুব আনন্দ। রানা বলল— বড়ো হলে আমি একটা ছানাকে বাড়ি নিয়ে যাবো। সন্দীপ বলল— আমিও একটা নিয়ে যাবো। চাল মুড়ি খেতে দেব। কিন্তু পিকাইয়ের মুখ ভার, বলল— এই গরমে ওদের কি কষ্ট হচ্ছে বল? গরমের জন্য আমাদের তো স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। আমরা তাই ভালো আছি কিন্তু দেখ না ছানাগুলো কেমন হা করে শ্বাস নিচ্ছে। রানা বলল— ওদের মা আছে, ঠিক ওদেরকে জল এনে দেবে।

তারপর বিকেলে আকাশ কালো করে এলো ঝড়, সেই সঙ্গে মুশলধারে বৃষ্টি। একেই বলে কালবৈশাখী। রাতেও থামার নাম নেই। শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে, উঠোন দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। পিকাই খেয়েদেয়ে মায়ের সঙ্গে শুতে গেল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। এই ঝড়ে দোয়েল ছানাগুলির না জানি কী হলো। ওদের বাসা বোধহয় ভেঙে গেছে। পিকাইয়ের মনে বার বার সেই চিন্তা আসছে। তারপর গভীর রাত পর্যন্ত চলল ঝড় বৃষ্টি। পিকাই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। পরের দিন সকালে উঠে দেখল চারিদিকে সব লণ্ডভণ্ড। গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে। পুকুর জলে থই থই। দু-একটা ব্যাঙ ডাকছে। পিকাই প্রথমেই দৌড়ে জানালার ধারের গাছটার নীচে গেল। তার আশঙ্কাই ঠিক। দোয়েলের বাসা ভেঙে গেছে। ছানাগুলি সব মাটিতে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে আছে। চিঁ চিঁ করে কাঁদছে তারা। আর মা বাবুই দূর থেকে খাবার এনে ছানাদের মুখে দিচ্ছে। পোকামাকড়, কেঁচো এই সব। ছানারা খাচ্ছে। ছানাগুলির গায়ে সবে পালক গজাতে শুরু করেছে। বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে গেছে সেগুলো। পিকাই ভাবলো— আহা রে কি কষ্ট তাদের! বাড়ি থেকে সে এক বাটি মুড়ি এনে দিল। কিন্তু ছানারা এতোই ছোট যে তুলে খাবার ক্ষমতাও হয়নি। দোয়েল পাখি দুটিও ভিজে গেছে। ছানাগুলোর কাছে উড়ে এসে করুণ সুরে ডাকছে। পিকাই একটা ঝুড়িতে করে শুকনো খড় দিয়ে বাসার মতো বানালো। তারপর ছানাগুলিকে একটা একটা করে তুলে গাছের ওপর রেখে দিল। মা দোয়েলের তখন খুব আনন্দ।

বিরাজ নারায়ণ রায়

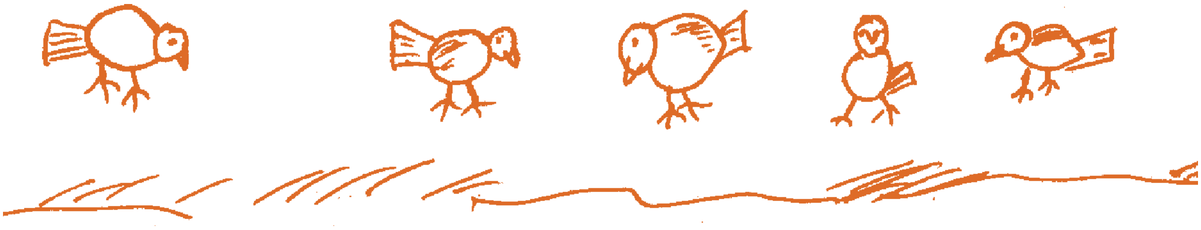

মনীষী কথা

মহাত্মা গান্ধী

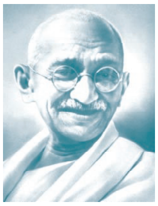

নবভারত গঠনের একজন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক মহাত্মা গান্ধী। রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভিতরের আত্মিক শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে তিনি এক নতুন ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। গ্রামীণ সভ্যতা ভারতের মূল ভিত্তি, তাই তিনি গ্রাম বিকাশের কথা বলেছেন। স্বাধীনতা আন্দোলন, কৃষি ও দেশীয় শিল্প তাঁর কাছে সব সমান।

মাহাত্মা গান্ধীর পুরো নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। জন্ম ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর, গুজরাটের পোরবন্দরে। ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডনে যান। সেখান থেকে ফিরে এসে যান দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং সেখানেই শুরু হয় তাঁর রাজনৈতিক জীবন। আফ্রিকায় কিছুদিন থাকার পর আবার ভারতে ফিরে আসেন এবং যোগ দেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত নিরলস ভাবে তিনি তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। ইংরেজ সরকার তাকে বহুবার কারারুদ্ধ করে। অবশেষে যখন খণ্ডিত হওয়ার মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা আসে তখন অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তিনি তা মেনে নেন।

প্রশ্নবাণ

১. কোন্ ঋষিকে যোগ প্রণেতা হিসেবে মানা হয়?

২. শিবাজীর রাজ্যাভিষেক কোন্ দুর্গে হয়েছিল?

৩. পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার সদস্য সংখ্যা কত?

৪. 'হিন্দু রসায়ণ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

৫. 'টেলিভিশন' শব্দের বাংলা অর্থ কী?

উত্তর : ১. পতঞ্জলি। ২. রায়গড়। ৩. ২৯৪টি। ৪. প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ৫. দূরদর্শন।

ছবিতে অমিল খোঁজ

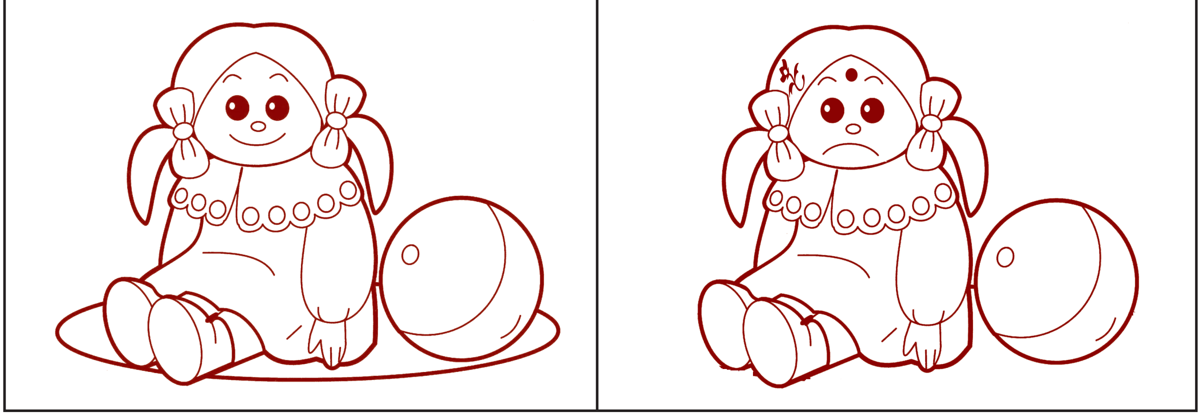

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) হি র ম সু

(২) ক গো ধাঁ ল

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) লা চ ত য় অ ন

(২) তা লা আ চা প রি

১৬ মে সংখ্যার সংখ্যার উত্তর

(১) দুগ্ধধবল (২) চিটিংবাজ

১৬ মে সংখ্যার সংখ্যার উত্তর

(১) সাগরসৈকত (২) তুষারধবল

উত্তরদাতার নাম

(১) সমন্বিতা সাহা, মঙ্গলবাড়ি, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

অঙ্গনা

নারীঘটিত

রূপশ্রী দত্ত

নারী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমার মায়ের কাছে শোনা গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকের দুটি ঘটনা মনে পড়ল। হাসির মোড়কে হলেও তাতে বেদনার অশ্রুজল। তৎকালীন এক কিশোরী বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল। শহরের মেয়ে। গ্রামের রীতিনীতি জানে না। বৌ দেখতে লোকে এলে, নববধূর মুদিত চক্ষু হওয়াই ছিল তৎকালীন রীতি। সেকথা তাঁর শাশুড়ি তাঁকে পই পই করে শেখালেও, নববধূ তাকে দেখতে আসা বিন্দুপিসির দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে রইল। বিন্দুপিসি একটু অবাক হয়ে তারপর হেসে হেসে বললেন— 'চার চোকে চাওয়াচাওয়ি হয়ে গেল। তা বেশ, তা বেশ, তা বেশ।' তারপর সরেজমিনে নিরীক্ষণ করার পর তাঁর মন্তব্য— 'আমাদের খেঁদুর (বধূর স্বামীর নাম) মাতায় মাতায় হয়ে গেল। তাবেশ...।' শেষমেষ— 'হ্যাঁ, র‍্যা, নতুন বোয়ের মুখে ময়দার গুঁড়োর পারা— ও সব কি? তা বেশ...।' নববধূ তখন লজ্জায় অধোবদন। দুর্মুখ বিন্দুপিসি সাঙ্কেতিকতার আড়ালে বধূর নিন্দাসূচক তিনটি প্রসঙ্গ রাখলেন। বধূর শ্যামবর্ণ, বে-মানান উচ্চতা ও 'সহবতজ্ঞানহীনতা'। বাক্য-ত্রিশূলের ঘায়ে তখন বধূর অবস্থা সঙ্গিন। কিন্তু আ-শৈশবের শিক্ষা— 'যে সয়, সে রয়/যে না সয়/সে নাশ হয়',— তাকে মেনে নিতেই শিখিয়েছিল।

আর একটি ঘটনা। দত্তক নিয়েছিলেন তৎকালীন এক নিঃসন্তান দম্পতি, তাঁদেরই জনৈক আত্মীয়ের কনিষ্ঠ পুত্রকে। তখন আইন-মোতাবেক ব্যাপারটি ছিল না। তাই ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞের মাধ্যমেই তাঁরা দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। কালক্রমে ছেলেটি কর্মজীবনে প্রবেশ করল এবং দত্তক পিতামাতা তার বিবাহ দিলেন। ছেলেটির সহোদরেরাও তখন বিবাহিত। একদিন ছেলেটির গর্ভধারিণী জননী দত্তক-জননীর কাছে আবদার করলেন— 'দিদি, আমার বোয়েরা, বড়ুয়া-কাননবালার ছবি দেখতে যাচ্ছে। মলিনা (ছেলেটির বৌয়ের নাম) কি ওদের সঙ্গে যাবে?' রাশভারী দত্তক-জননী দৃঢ়কণ্ঠে বললেন— 'না বৌ, নিজের বোয়েদের নষ্ট করছ করো। আমার বৌকে নষ্ট করতে এসো না'। গর্ভধারিণী জননী অধোমুখে নিরাশ হয়ে গৃহের পথে পা বাড়ালেন।

আজকের দিনে ঘটনাটি হাস্যকর মনে হবে। কিন্তু অধিকারবোধের সংজ্ঞা তৎকালীন সামাজিকতায় এমনটিই ছিল এবং সহন-গুণে, নারীরা তা মেনেও নিয়েছিলেন। এখন অবশ্যই সে-সব চিত্র দুর্লভ। নারীর প্রতিকূলতা আজও আছে। কিন্তু আনুকূল্যও এসেছে অনেক ক্ষেত্রে, একথা অনস্বীকার্য। নারীর ওই উত্তরণ এসেছে রামমোহন, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি পুরুষের হাত ধরেই। নারী-পুরুষ তাই পরস্পর প্রতিযোগী নয়, সহযোগী।■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

SIP! SIP! SIP!
RECURRING DEPOSIT
Rs. 2000/- PM
SINCE 1995
TOTAL INVESTMENT
Rs. 4.86 LACS
BECOMES Rs. 1.01 Cr.
THIS RETURN
IS TAX FREE
DRS INVESTMENT
MOBILE
9830372090 / 9748978406

উত্তরাখণ্ড পর্বের পরবর্তী কংগ্রেস

অতিথি কলম

প্রতাপ ভানু মেহতা

উত্তরাখণ্ড বিধানসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগত জয় দলকে যৎকিঞ্চিৎ চাঙ্গা বোধ করার টনিক হয়তো দেবে। এক্ষেত্রে বিজেপি দলের কিছুটা ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের সঙ্গে তড়িঘড়ি করে ৩৫৬ ধারা জারি করা ও সেই পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ আদালতের কিছুটা সরকার পক্ষকে আগলে রাখার একটা নিরুচ্চার প্রক্রিয়া এ যাত্রা কংগ্রেসকে কিছুটা হাঁফ ছাড়ার অবকাশ দিয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসকে মনে রাখতে হবে বিরোধীর তরফে কোনো ভুল চাল দেওয়া কখনই তার নিজস্ব কৌশল বা পরিকল্পনার বিকল্প হতে পারে না। তাই বলছি, কংগ্রেসের দীর্ঘকালীন চ্যালেঞ্জ অত্যন্ত গুরুগম্ভীর অবস্থাতেই রয়েছে। আর এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় যে ধরনের চিন্তাভাবনার উঠে আসা দরকার তার কিন্তু কোনো প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না।

প্রথম চ্যালেঞ্জটিই ছিল উত্তরাখণ্ড। এক্ষেত্রে বিজেপি অতি সক্রিয়তা দেখানোর শিকার। তবে তার জন্য উত্তরাখণ্ডে কংগ্রেস দলের পক্ষে যে ক্রমবর্ধমান কোনো জনপ্রিয়তার ঢেউ দেখা যাচ্ছে এমনটা আদৌ নয়। বিজেপির তরফে রাজনৈতিক পাশাখেলা শুরুর আগে

> “দুর্নীতির যে ভাবমূর্তি রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সমার্থক হয়ে আছে তা হলো এক প্রাচীন রাজত্ব যার প্রভুরা বরাবর সুযোগ সুবিধে ভোগ ও দুর্নীতির এক দলীয় অন্তর্জালে সদা ডুবে থাকতেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ভাবমূর্তিটি আদৌ মলিন হয়নি।”

পর্যন্ত কংগ্রেস ছিল এক দল বিক্ষুব্ধের বাহিনী। অথচ বিজেপির চালেই এঁরা যেন শহিদের মর্যাদা পেয়ে গেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেল দলে কাঠামোগত বড় পরিবর্তন দরকার। সুশাসন জারি রেখেছে এমন কোনো বড় রাজ্য তাদের অধীনে আছে বলে কংগ্রেস কি দাবি করতে পারবে?

তাই বলছি, দেশের কোনো লোকসভা নির্বাচনে যাওয়ার আগে বড় কোনো রাজ্যে বলার মতো কোনো মুখ্যমন্ত্রী তথা নেতা কংগ্রেসর নেই। এরকম কিন্তু দেশে বড় একটা দেখা যায়নি। অর্থাৎ সেই মুখ্যমন্ত্রীর সাফল্যের সঙ্গে রাজ্য চালিয়ে নিজেই দলের পক্ষে বিজ্ঞাপন হয়ে ওঠার কথা বলছি।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটা জিনিস ভুলে যাই যে ২০১৪ সালে কেবলমাত্র গুজরাট সাফল্যের মডেল ঘিরেই বিজেপি সর্বভারতীয় বিজয় পায়নি, সঙ্গে কিছু সুশাসক মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তিও একটা বড় মানদণ্ড হিসেবে দেখা দিয়েছিল। আর এই সংখ্যাটা ছিল নয় নয় করে চার, যাঁদের প্রত্যেককেই সুশাসনক্ষম বলে মানুষ বিশ্বাস করেছিল। ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই শুধুমাত্র কেরল ছাড়া যার নির্বাচনী ফলাফল এর মধ্যেই জানা যাবে তাই কর্ণাটক বা উত্তরাখণ্ডের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সংখ্যাধিক্যের নিরিখেই সব কিছু নির্ধারিত হয় না। এইগুলির অন্য তাৎপর্য আছে। দুটি রাজ্যের পরিস্থিতিই কংগ্রেস দলকে সুশাসন দেওয়ার উপযুক্ত বলে আদৌ কোনো আত্মবিশ্বাস জোগাবে না। উত্তরাখণ্ড কাণ্ড থেকে কংগ্রেসের বোঝা দরকার যে রাজ্যের শাসন পদ্ধতিতে গোটাগুটি পরিবর্তন দরকার। রাজ্যটি ছোট হওয়ায় মনে হতে পারে এখানকার ভালমন্দের প্রভাব সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে খুব একটা হেরফের ঘটায় না। হয়তো ঠিক। কিন্তু সুশাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সুনাম তৈরি করতে একটির ওপর একটি ইট পর পর গেঁথে যেতে হয়। তবেই পরে নজরে পড়ে বা খবরে আসে।

এর মধ্যে নির্বাচনী পেশাদার প্রশান্তভূষণকে দলে নিযুক্ত করার হয়তো কোনো ভেতরকার গল্প থাকতে পারে। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় দল হয়তো এটুকু অন্তত বুঝেছে যে তাদের নতুন চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে। তাঁর কাছ থেকে এটা আশা করা যেতেই পারে যে তিনি হয়তো ঝিমিয়ে পড়া ঘনিষ্ঠ নেতাদের মতো না থেকে নেতৃত্বকে কিছু কঠিন প্রশ্নের মুখোমুখি করবেন।

আরও একটা সত্য এই নিয়োগের মাধ্যমে উঠে এসেছে যে কংগ্রেস এই যোগাযোগ-নিবিড়তার যুগে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আজকের রাজনীতি যে কতখানি যোগাযোগ নির্ভর তা বুঝতে দলের বেশ দেরি হয়েছে। আশা করা যায় এবার তারা সেই ‘প্রস্তর যুগ’ থেকে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু দল এখন পড়েছে শাঁখের করাতে। তারা সেই একটি মাত্র পরিবারের ওপর না পারছে নির্ভরতা কাটাতে, না পারছে

আজকের পরিস্থিতিতে তাদের ঘাড়ে নিয়ে চলতে। সবচেয়ে বড় যে দায় এই পরিবার দলের ওপর চাপিয়েছে তা হলো দুর্নীতির পাহাড়। এক্ষেত্রে দুর্নীতি বলতে আমি কখনই কোনো ব্যক্তিগত দুর্নীতির কথা বলছি না। সে সব আদালত বিচার করে ঠিক করবে। আমি বোঝাতে চাইছি ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীর কথা। দুর্নীতির ক্ষেত্রে এই ভোটারদের আচার আচরণ খানিকটা আপাত বৈপরীত্যে ভরা। তারা এক দিকে চাইছে দুর্নীতির পূর্ণ নিকেশ কিন্তু কোনো বড় নেতার সরাসরি সাজা হওয়ার প্রশ্ন উঠলেই তারা যেন কেমন সমবেদনায় গুটিয়ে যাবার অবস্থান নিচ্ছে। উদাহরণ দিয়েই বলা যায় গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্ত যদি ঘুণাক্ষরেও মনে হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাহলেই তা কিন্তু বুমেরাং হয়ে ফিরবে।

কিন্তু দুর্নীতির যে ভাবমূর্তি রাজনৈতিকভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে সমার্থক হয়ে আছে তা হলো এক প্রাচীন রাজত্ব যার প্রভুরা বরাবর সুযোগ সুবিধে ভোগ ও দুর্নীতির এক দলীয় অন্তর্জালে সদা ডুবে থাকতেন। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ভাবমূর্তিটি আদৌ মলিন হয়নি। সত্যি কথা বলতে যখনই তোমাকে বলা হবে তুমি এক ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন শাসনের প্রতিভূ তখন তোমার কাছে দুটো মাত্র পুনরুত্থানের রাস্তা খোলা থাকবে। একটি হলো হয় তুমি তোমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো ও সঙ্গে এমন কিছু করে দেখাও যাতে তোমার দ্বারা মানুষ অনুপ্রাণিত হয় এবং একথা বিশ্বাস করে যে সত্যিই তুমি নিজেকে বদলেছ। আর দ্বিতীয় পথটি হলো তুমি অধিনায়ক পাল্টাও। অবশ্য, এই মুহূর্তে কংগ্রেসের তরফে কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না।

এবার আর একটি বিষয়ের কথা বলব যার মাধ্যমে এই প্রথম পরিবার দলটিকে নিঃস্ব, দেউলিয়া করে ছেড়ে দিয়েছে। দলের অভ্যন্তরে যে সমস্ত প্রতিভাবান মানুষের অবস্থিতি রয়েছে দল তাদের সর্বদা খাটো করে দেখাচ্ছে। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে একটা জিনিস অবশ্যই নজরে পড়বে যে যখনই কোনো দল বড় বড় রাজনৈতিক পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছে তখনই সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বেশ কিছুটা সময় ধরে সদস্যদের বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন।

কিন্তু এই জিনিসটাই নাগরিকদের ভাবাচ্ছে যে এই দলে কোনো বিরোধিতার আভাসই নেই যা থেকে একটা রাজনৈতিক দলের চরিত্র বোঝা যায়। এখনও সেই কেন্দ্রীভূত অবস্থায় বিরাজমান ও নেতৃত্ব দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ব তুলে আনতে অক্ষম। এর ফলে প্রথম যে অনুভূতি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে তা হলো তীব্র বিতৃষ্ণা। মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো মেরুদণ্ডের অভাব।

রাজনীতিতে অবশ্যই অনেক কিছু নির্ভর করে পরিস্থিতি বা অবস্থার ওপর। এখন অর্থনীতি যদি মুখ থুবড়ে পড়ার দিকে যায় বা দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার অবস্থা হয় সেক্ষেত্রে কংগ্রেস হয়তো দম পেতে পারে। কিন্তু হায়! প্রথমটি অর্থাৎ অর্থনীতির মুখ থুবড়ে পড়া সেটি আদৌ হবার নয়। যদিও তা সরকার যতটা চাকচিক্যময় বলে তুলে ধরতে চায় তা না হলেও অর্থনীতির গতি ঊর্ধ্বমুখীই থাকবে, একথা নিশ্চিত। আর ২০১৭ ও ২০১৮ সালে তা তুমুল বাড়বাড়ন্তের দিকে যাবে। বাস্তবে গত তিন চার মাসে অর্থনীতিতে পরিবর্তনের সদর্থক আভাস নজরে পড়েছে। অর্থনীতির গতি আগের দেড় বছরের থেকে অনেক সুনিয়ন্ত্রিত পথে চলেছে। তবে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের বিষয়টা পুরোপুরি বিজেপির পরিস্থিতির ভুল বিচারের ওপর নির্ভর করে।

তাই বলছি, একটি নির্বাচন জেতার ক্ষেত্রে মূলত চারটি কৌশলের কার্যকরী প্রয়োগ জরুরি হয়ে পড়ে—

(১) যদি তুমি শাসনে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো তাহলে ঈর্ষণীয় পরিসংখ্যান দেখানো অত্যাবশ্যক।

(২) যদি শাসকের উল্টো দিকে থাকো তাহলে নতুন কী আশার আলো দেখাতে পারবে তা জানাও। কংগ্রেস আদৌ এই জায়গায় নেই।

(৩) তুমি বিপুল কোনো ক্ষোভকে মান্যতা দিয়ে পরিস্থিতিকে অশান্ত করে সুযোগ নিতে পারো। কিন্তু অর্থনীতি মোটামুটি ভাবে ভাল অবস্থায় থাকলে লোককে সেভাবে উত্তেজিত করা দুষ্কর যেমনটা ২০১৪ সালে হয়েছিল।

(৪) দেশের নানান জায়গায় সামাজিক অসন্তোষ দানা বাঁধতে পারে কিন্তু এগুলি একান্তই স্থানীয় বা সেই অঞ্চল নির্ভর। সেক্ষেত্রে গুজরাট বা হরিয়ানায় কংগ্রেসকে বিশেষ কায়দা উদ্ভাবন করে পরিস্থিতি নিজের দিকে টানতে হবে। কিন্তু উত্তর প্রদেশে এ কাজ কঠিন। শেষে দলের সাধারণ নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতাকে পুঁজি করে জনগণের কাছে যাওয়া। এই সাবজেক্টেও কংগ্রেস জিরো পাচ্ছে। এমন কোনো নেতা তাদের দলে নেই অথচ সবার মধ্যে একটা ঠাট ঠিক বজায় আছে সেই সবচেয়ে বড় নেতা তার অনেক কিছু পাওয়ার যোগ্যতা আছে।

তাই বাজারে যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে উত্তরপ্রদেশে সেই প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকেই মুখ হিসেবে তুলে ধরা হবে তাতে আবার প্রমাণ হচ্ছে যে কংগ্রেস আশা দেখাতে অপারগ। অপারগ মানুষের ক্ষোভকে তুলে ধরতে, তেমনি অপারগ সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রেও। তাই এই ক্ষয়িষ্ণু কংগ্রেস দলের সর্বাগ্রে যেটা দরকার যদি বিশ্বাসযোগ্যতাকে আদৌ পুনরুদ্ধার করতে হয়— তা হলো একটি টাটকা মুখ। সেই একমাত্র কিছু করে দেখাতে পারলেও পারতে পারে। তাই আবার বলছি, উত্তরাখণ্ডে রাওয়াত সরকারের গদি ফিরে পাওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বিশাল নৈতিক জয়ের ধ্বজা বহন করার বদলে এখন সময় অন্তর্মুখী হওয়ার। দল এখন নিরাশার প্রান্তিকসীমায় দাঁড়িয়ে আছে। এই আশাহীনতা থেকে পার পেতে গেলে দরকার হবে বিপুল সাংগঠনিক শক্তি, আদর্শগত পুনরুজ্জীবন, সিদ্ধান্ত নেবার মতো দৃঢ় নেতৃত্ব ও তুমুল রাজনৈতিক সাহসের। নির্বাচন এখন বহু দূরে। কিন্তু আগামী দু' বছর দলের অস্তিত্ব রক্ষা ও পুনরুত্থানের পক্ষে ভয়ানক তাৎপর্যপূর্ণ।

বিধানসভা নির্বাচন ২০১৬ : আঞ্চলিকতাবাদের পৃষ্ঠভূমি উত্তরবঙ্গে জাতীয়তাবাদের মহড়া

সাধন কুমার পাল

All's fair in love and war--- ইংরেজি এই প্রবাদ বাক্যটি বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায় প্রেমে ও যুদ্ধে কোনো কিছুই অবৈধ নয়। গণতন্ত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়াকেও অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দল কিংবা ব্যক্তির মধ্যে ক্ষমতা দখলের যুদ্ধ বলা যেতে পারে। ২০১৬-র পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএমের মতো দলগুলি একটি বড় অভিযোগ এনেছে যে বিজেপি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করে কোচবিহার ও দার্জিলিংকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে। উল্লেখিত ইংরেজি প্রবাদের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে এই নির্বাচনী যুদ্ধে বিজেপি অবৈধ কিছু করেনি। কিন্তু অভিযোগটি যেহেতু দেশের ঐক্য সংহতির সঙ্গে জড়ানো একটি গুরুতর বিষয়, সেজন্য নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন দলীয় সংকীর্ণতা সরিয়ে রেখে বিজেপির এই নির্বাচনী আঁতাত বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুনকে উস্কে দেবে না সংহতির সুতো আরো দৃঢ় করবে এই বিষয়টির একটি বাস্তব বিশ্লেষণ জরুরি।

এবারের নির্বাচনে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদ, আদিবাসী বিকাশ পরিষদ প্রত্যক্ষভাবে বিজেপিকে সমর্থন জানিয়েছিল। প্রত্যাশা মতোই তৃণমূলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিভিন্ন অ-বিজেপি নেতারা নিজেদের পশ্চিমবঙ্গের অখণ্ডতা রক্ষার স্বঘোষিত সৈনিক হিসেবে ঘোষণা করে কোচবিহারে গ্রেটারের সমর্থন নেওয়ার জন্য পূর্ববঙ্গীয় ভোটারদের মধ্যে এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সমর্থন নেওয়ার জন্য দার্জিলিঙে বাঙালি ভোটারদের মধ্যে পৃথক রাজ্যের আতঙ্ক তৈরি করে ভোটের ঢেউ নিজেদের দিকে টেনে আনার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত কিছুই বললেন ও করলেন। ভোট আসবে ভোট যাবে, ভোটের ফলাফল ঘিরে নানারকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হবে, কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদের অভিঘাতে দিশেহারা বর্তমান ভারতে পরস্পর বিপরীত মেরুতে অবস্থিত বিভিন্ন আঞ্চলিক দলের সঙ্গে বিজেপির মতো জাতীয় দলের এই

উত্তরবঙ্গের বীরপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী জনসভা (ফাইলচিত্র)।

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির রাজনৈতিক সহযোগী হয়ে ওঠার পিছনে বিভিন্ন আঞ্চলিক দল ও সংগঠনগুলির নিজ নিজ রাজনৈতিক অঙ্ক থাকবে এটাই স্বাভাবিক। জাতীয় দল হিসেবে নিজস্ব রাজনৈতিক অঙ্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে আঞ্চলিক দলগুলির রাজনৈতিক অঙ্ক মেলানো বিজেপির পক্ষে সহজ হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, কী সেই অঙ্ক যা কিনা এই সংগঠনগুলিকে বিজেপিমুখী হতে সহায়তা করেছে।

ভোট-জোটের ময়না তদন্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রথমেই বিজেপির একটি নির্বাচনী সভার দৃশ্য দেখে নেওয়া যাক। মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দু'পাশে বসে রয়েছেন গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশন, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদ, আদিবাসী বিকাশ পরিষদের শীর্ষ নেতৃত্ব। মঞ্চের নীচে হাজার হাজার বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে শ্রোতা হিসেবে রয়েছেন এই সমস্ত সংগঠনের সমর্থকরাও। গ্রেটার সমর্থকরা হলুদ পতাকা নিয়ে আসায় এই সংগঠনের সমর্থকদের উপস্থিতি পৃথক ভাবেই বোঝা যাচ্ছিল। সভায় মুহুর্মুহু আওয়াজ উঠছে ভারতমাতা কী জয়, বন্দেমাতরম্। স্লোগানে গলা মেলাচ্ছেন মঞ্চের উপরে নীচে সবাই। সমস্ত সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব ভারতমাতার জয়ধ্বনিতে এক হয়ে যাওয়ার মতো বিরল দৃশ্যের সাক্ষী হয়ে থাকলো এবারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে বীরপাড়া ও শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভা। প্রত্যেক সংগঠনের নেতৃত্বের বক্তব্যেই এবারের নির্বাচনে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি বিজেপিকে সমর্থন করার আহ্বান থাকলেও কেউ পৃথক রাজ্যের দাবির শর্তে বিজেপিকে সমর্থন করছেন এমনটা শোনা যায়নি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং-য়ের সভা সহ বিজেপির অন্যান্য নির্বাচনী সভায় একই দৃশ্য ফুটে উঠেছিল। সবাইকে এক মঞ্চে নিয়ে এসে একসঙ্গে ভারতমাতা কী জয় বলানো জাতীয় সংহতির দৃষ্টিতে বিজেপির একটি বড় সাফল্য।

জিসিপিএ-র স্বপ্নের গ্রেটার কোচবিচার রাজ্যের একটি অংশ নিয়েই গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা পৃথক গোর্খাল্যান্ড গঠনের স্বপ্ন দেখছে, আবার আরেকটি অংশের মধ্যেই গঠিত হয়েছে বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট (বিএটিডি), যেখানে ক্ষমতায় আছে হাগ্রামা মহিলারির নেতৃত্বাধীন বড়োল্যান্ড পিপলস্ ফ্রন্ট (বিপিএফ)। গ্রেটার কোচবিহারের দাবিদারদের কাছে গোর্খা ও বড়োরা অবৈধ দখলদার হিসেবে গণ্য হবেন এটাই স্বাভাবিক। রাজনৈতিক দর্শন ও লক্ষ্য সংঘাতপূর্ণ হলেও এই আঞ্চলিক সংগঠনগুলি অসম ও পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির রাজনৈতিক সহযোগী। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে বিজেপির পক্ষে আঞ্চলিক দলগুলির প্রত্যেকের স্বপ্নের পৃথক রাজ্যের দাবির স্বপক্ষে দাঁড়ানো সম্ভব নয় এটা বুঝেই এই নির্বাচনী জোট গড়ে উঠেছে।

কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপির রাজনৈতিক সহযোগী হয়ে ওঠার পিছনে এই সংগঠনগুলির নিজ নিজ রাজনৈতিক অঙ্ক থাকবে এটাই স্বাভাবিক। জাতীয় দল হিসেবে নিজস্ব রাজনৈতিক অঙ্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে আঞ্চলিক দলগুলির রাজনৈতিক অঙ্ক মেলানো বিজেপির পক্ষে সহজ হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, কী সেই অঙ্ক যা কিনা এই সংগঠনগুলিকে বিজেপিমুখী হতে সহায়তা করেছে।

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে সমস্ত ইস্যুর ভিত্তিতে আঞ্চলিক দলগুলির উৎপত্তি তাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। ১। উন্নয়ন, আঞ্চলিক কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা, জাতীয় অবিতর্কিত ইস্যু। ২। পৃথক রাজ্য, কোনো বিশেষ শ্রেণীতে সংরক্ষণ জাতীয় বিতর্কিত ইস্যু। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ হচ্ছে জাতীয় দল হিসেবে বিজেপির আদর্শগত ভিত্তি। সে জন্য ভারতের যে-কোনো প্রান্তের যে-কোনো আঞ্চলিক দলের উন্নয়ন, আঞ্চলিক কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষা জাতীয় যে কোনো অবিতর্কিত ইস্যুগুলিকে নিজেদের ইস্যুর সঙ্গে জুড়ে দিয়ে সেগুলিকে রূপায়িত করা বা রূপায়ণে সহায়তা করা বিজেপির পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ ব্যাপার। যেমন, ভারতীয় সেনায় বিভিন্ন রেজিমেন্টের মতো নারায়ণী সেনা নামে আরেকটি রেজিমেন্ট তৈরি করা, মনীষী পঞ্চানন ও বীর চিলা রায়কে পাঠ্যসূচীভুক্ত করা, কোচবিহার জেলা ও রাজবংশী সমাজের উন্নয়ন, রাজধানী দিল্লীর কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থানে কিংবা সংসদ ভবনে বীর চিলারায়ের মূর্তি স্থাপনের মতো গ্রেটার কোচবিহার পিপলস্ অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন ইস্যু কিংবা অল ইন্ডিয়া নমঃশূদ্র বিকাশ পরিষদের নাগরিকত্বের ইস্যুগুলিকে নির্বাচনী জনসভায় বিজেপির পক্ষ থেকে এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে বিষয়গুলি যেন পার্টির নিজস্ব ইস্যু। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ আদর্শগত ভিত্তি হওয়ার জন্য এই সমস্ত নিয়ে বিজেপি নেতাদের আবেদনে অন্য মাত্রা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। সাধারণভাবে মানুষ জানে কাশ্মীর ভারত বিরোধী, জম্মু কাশ্মীর বিরোধী এই বৈপরীত্বের মধ্যেও ওই একই রসায়নের জোরে বিজেপি ওই রাজ্যের সরকারে টিকে থাকার প্রয়াস চালাচ্ছে।

অসমে অসম গণপরিষদের মতো আঞ্চলিক দলের এক সময়ের দাপুটে নেতা সর্বানন্দ সোনোয়াল এখন অসম বিজেপির সর্বেসর্বা। সোনোয়ালের আঞ্চলিক থেকে জাতীয় দলের নেতায় পরিণত হওয়ার ঘটনাটিকে নুনের পুতুলের সমুদ্র মাপতে গিয়ে সমুদ্রে মিশে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। ভবিষ্যতেও বিজেপির মতো জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলির এই মেলামেশায় সর্বানন্দ সোনোয়ালের মতো নুনের পুতুলেরা জাতীয়তাবাদের সমুদ্রে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছেই। কারণ আঞ্চলিক স্বাভিমান বজায় রেখেও বিজেপির সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছেন, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

জলের জন্য হাহাকার, কুয়ো খুঁড়ছে পিপানটোলা

সন্দীপ চক্রবর্তী

জলের আরেক নাম জীবন। সেই জীবন যদি বাড়ন্ত হয় তাহলে মানুষ কী করতে পারে? প্রশ্নটা ছত্তিশগড় রাজ্যের পিপানতলা গ্রামের কোনো মানুষকে করলে একটাই উত্তর পাওয়া যাবে— লড়াই। জীবনকে ফিরে পাওয়ার লড়াই। কিন্তু কীভাবে? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় পাওয়া যাবে না। যেতে হবে গ্রামের ভেতর। সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে কুয়ো খোঁড়া চলছে। হাত মিলিয়েছে বাচ্চা-বুড়ো সবাই। কারণ কুয়োটা গ্রামের। সারা গ্রামকে জল দেবে এই কুয়ো। তাই একটা হাতও বাদ পড়েনি।

ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকাল মানে দুঃস্বপ্ন। প্রত্যেক বছর খরা, চাষের ক্ষতি, পানীয় জলের সঙ্কট, অর্ধাহার-অনাহার, অসুখবিসুখ— এসব লেগেই থাকে। গত কয়েক বছর ধরেই এখানকার বাসিন্দারা প্রকৃতির এই ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন চাইছিলেন। কুয়ো খোঁড়ার পরিকল্পনা তারই সূত্র ধরে।

ছত্তিশগড়ের কবীরধাম জেলার অন্তর্গত পাহাড়ে ঘেরা ছোট গ্রামটি। মূলত বৈগা জনজাতিদের বাস। বৈগাদের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান (সর্বশেষ জনগণনায় ৭২,০০০-র নীচে) বলে বৈগারা সরকারি খাতাপত্রে ‘বিশেষভাবে সংরক্ষিত’ জনজাতির কৌলিন্য পেয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সরকারি দান-খয়রাতের ওপর নির্ভর করে থাকতে তারা নারাজ।

কিন্তু যার বিরুদ্ধে এই জীবনপণ সংগ্রাম সেই সঙ্কটের চেহারা ঠিক কীরকম?

‘আমাদের ছোট নদীটা একবার দেখে আসুন। তাহলেই বুঝে যাবেন খরা বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি’। এক গ্রামবাসী বললেন। তাঁরই কাছ থেকে জানা গেল নদীর নাম অগর। যদিও এখন তাকে নদী না বলাই ভালো। প্রচণ্ড দাবদাহে নদীখাত শুকিয়ে কাঠ। শুধু একজায়গায় খানিকটা হাঁটুডোবা জল রয়ে গেছে। সেখানেই চলছে গ্রামের কাপড় কাচা, বাসনপত্র মাজাধোয়ার কাজ। মাঝবয়েসি যুগতিবাই কাপড় কাচছিলেন। তাঁর গোরুটি চরে বেড়াচ্ছে নদীর চরে। প্রশ্নের উত্তরে বললেন, ‘নদীর জল যদি এভাবে শুকিয়ে যায় তাহলে আমরা সবাই মারা পড়ব। তাই কুয়ো খুঁড়ছি।’

যতদূর চোখ যায় শুধু কষ্টের ছবি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কারও মুখ থেকে হাসি মোছেনি। যুদ্ধ জারি আছে। কষ্টের দিন শেষ হলো বলে। অথচ এই হাসির লেশমাত্র ছিল না দশ বছর আগে। সেবার এই রকমই ভয়ঙ্কর খরার ফলে দুর্ভিক্ষ লেগে গিয়েছিল। গ্রামকে গ্রাম ছারখার। সব থেকে বেশি ক্ষতি সিঁদুরকর আর পিপানটোলা গ্রাম দুটির। সেই স্মৃতি মনে

পিপানটোলায় গ্রামবাসীরা কুয়ো খোঁড়ায় ব্যস্ত।

পড়লে এখনও শিউরে ওঠেন বৃদ্ধ ও মাঝবয়েসিরা। আর তারপরেই রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ দেন। প্রশংসা করেন পঞ্চমুখে। ওরকম দিন আর ফিরতে না দেওয়ার জন্য। প্রত্যেক জনজাতি পরিবারকে ৩৫ কেজি করে চাল দেওয়ার জন্য।

আলাপ হলো নরেশ বাঙ্কারের সঙ্গে। তিনি এই অঞ্চলে জনজাতিদের অধিকার নিয়ে সমাজসেবামূলক কাজ করেন। মূলত তাঁরই নেতৃত্বে কুয়ো খোঁড়ার কাজ চলছে। তিনি বললেন, 'বৈগাদের যাবতীয় প্রয়োজন মেটাত অগর নদী। কিন্তু এ বছর নদীর উৎসমুখ শুকিয়ে যাওয়ায় বিশুদ্ধ জল ঢোকার রাস্তা বন্ধ। বদ্ধ জল যেমন নোংরা তেমনই অস্বাস্থ্যকর। পানীয় জল হিসেবে ব্যবহারের অযোগ্য'। কুয়ো খোঁড়া প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'দু'মাসে আমরা কিছুটা এগিয়েছি। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি। গ্রামের সবাই চেষ্টা করছে। আমরা আশাবাদী।'

কিন্তু পানীয় জলের সমস্যার সমাধান হলেই কি এই অঞ্চল বেঁচে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল একটু দূরে। পিপানটোলা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে সিঁদুরকর গ্রাম। বৈগাদের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশের বসবাস এই গ্রামে। যাঁরা মূলত চাষাবাদ করেন। সেই সুবাদেই তাঁরা জানেন পানীয় জলের পাশাপাশি সেচের জল এখানকার আরেকটি সমস্যা। সামারু বৈগা এমনই একজন বৈগা চাষি। বললেন, 'প্রত্যেকবছর আমরা সিকিয়া, মারিয়া, কুডোকুটকি জাতীয় খাদ্যশস্যের চাষ করি। কখনও সখনও জোয়ার বাজরাও হয়। সারা বছরের খাবারটা চাষ থেকেই উঠে আসে। কিন্তু এ বছর একেবারে বৃষ্টি নেই। ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই শেষ।' অবস্থা এতটাই খারাপ গোটা গ্রাম পাঁচ মাস ধরে শুধু সরকারের দেওয়া ভাত আর চারোটা পাতা ভাজা খেয়ে আছে।

সামারুর বাড়ির পাশেই থাকেন সুক্রত দাস মানিকপুরী। বিপদে আপদে বৈগারা সবার আগে তাঁর কাছে ছুটে আসে। তিনি বললেন, 'শুধু চাল না দিয়ে বৈগাদের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন এমন সব কিছুই যদি সরকার রেশনের মাধ্যমে দেয় তা হলে সব থেকে ভালো হয়। বেশিরভাগ বৈগা পরিবারে ৪/৫টা বাচ্চা। কারও কারও ৮/৯টাও হয়। শুধু ভাত খেয়ে খেয়ে আমাদের পুষ্টির অবস্থা শোচনীয়। আমাদের আরও সরকারি সাহায্যের প্রয়োজন।' সুক্রত দাস মানিকপুরীকে সমর্থন করলেন নয়ন সিং বৈগা। বাড়িতে স্ত্রী এবং মা ছাড়াও ৪টি বাচ্চা। সরকারি চাল মাসের মাঝখানেই শেষ হয়ে যায়। তখন ২০ টাকা কেজি দরে কেনা খান্ডা ভরসা। খান্ডা হলো এক ধরনের খারাপ মানের চাল। এই চালে প্রচুর পরিমাণে ছোট বড়ো মাঝারি কাঁকর মিশে থাকে। চাল থেকে এই কাঁকর বাছতে হয়। কিন্তু কিছু কাঁকর এতই ছোট যে চালানির ছিদ্রেও আটকায় না। অনেক সময় চোখেও পড়ে না ভালো করে। নয়ন বললেন, 'আমাদের সকলের পেটের সমস্যা। যন্ত্রণা হয়। ডাক্তার বলে দিয়েছে দিনরাত কাঁকর মেশানো ভাত খেয়ে এরকম হয়েছে। কী যে করি কিছু বুঝতে পারি না।'

অসহায়তা কুরে কুরে খায় মানুষগুলোকে। একটা সময় ছিল যখন এখানকার জঙ্গলে আমলকী হরিতকী বয়রা জাতীয় গাছ প্রচুর পাওয়া যেত। গাছের ফল আর পাতা দুইই ছিল মানুষের খাবার। কিন্তু ইদানীং সেসব গাছ আর চোখে পড়ে না। শুধু শাল। সে গাছ যত দামীই হোক তা দিয়ে মানুষের পেট ভরে না।

অভাব থাকলেই ক্ষোভ থাকে। দানা বাঁধে রাজনীতি। কিন্তু গ্রামের সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায় তারা এসবের ধারকাছ দিয়েও যান না। তাঁরা নিজেরাই বলে দেন সরকার তাঁদের কথা ভাবে। চেষ্টাও করে তাঁদের উন্নতির জন্য। বিশেষ করে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার খুবই সচেষ্ট। নলজল যোজনার আওতায় অগর নদীর ধারে পাম্পিং স্টেশন, কুয়ো, প্রত্যেক বাড়িতে জল দেওয়ার জন্য মাটির নীচে পাইপলাইন বসানো ইত্যাদি তার প্রমাণ।

কিন্তু সমস্যা হলো গরমের সময় মাসে দশদিনও কলে জল থাকে না। প্রশাসন থেকে জলের গাড়ি পাঠানো হয়। ২/৪ দিন তাতে চলে। 'শেষমেশ নদীই আমাদের ভরসা। এ বছর সেই নদীতেও জল নেই। তাই অবস্থা এত খারাপ। বললেন মঙ্গল বৈগা। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল গত কয়েকবছরে সরকার এখানে বেশ ক'টি গভীর নলকূপও বসিয়েছে। কিন্তু এখানকার জলে প্রচুর খনিজ পদার্থ। জলও দূষিত। প্রমাণস্বরূপ মঙ্গল বৈগা নলকূপের জল বোতলে ভরে এনে দেখালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই জলের উপরিভাগ হলুদ আর নীচটা থকথকে লাল হয়ে গেল। মঙ্গল হাসলেন, 'আমরা জানি না এই জলে কী আছে। সরকার থেকে পিউরিফায়ার দিয়েছিল কিন্তু এই জল মেশিন নিতে পারেনি। আমরা শুধু এইটুকু জানি এই জল খাওয়া তো দূর কোনো কাজই করা যাবে না।'

এই যেখানে অবস্থা, সেখানে সমস্যার সমাধান করার জন্য পুরোপুরি সরকারের ওপর নির্ভর করাটা যে নির্বুদ্ধিতা সেটা এই দুটি গ্রামের বাসিন্দারা বুঝেছেন। কুয়ো খোঁড়ার জন্য এগিয়ে এসেছেন সকলে। পিপানটোলার কুয়োতলায় এখন রথযাত্রার ভিড়। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ব্যস্ত সবাই। তাঁরা বোধহয় জানেনও না কোন ইতিহাস তাঁরা সৃষ্টি করতে চলেছেন। সাধারণত সরকারের ওপর সমস্ত দায় চাপিয়ে দিতেই আমরা অভ্যস্ত। সেখানে সরকারকে সাহায্য করতে একটা গোটা গ্রামের এগিয়ে আসা— এরকম ঘটনার কথা শোনা যায় না। তাই মনে হয় আজ না হোক কাল পিপানটোলার কুয়োয় জল উঠবেই। কিন্তু সেই জল খেয়ে শুধু পিপানটোলার নয় সারা দেশের বুক জুড়িয়ে যাবে। হয়তো আমরা যারা একটা ছোট দুনিয়ায় বসবাস করি তারাও অন্যের জন্য সকলের জন্য, সবাই মিলে এগিয়ে যেতে শিখব। ■

বেঙ্গল ক্যাডার হিসাবেই কাজ করতে চান শ্বেতা

অদ্ভুত রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সাফল্য অনেক সময় মাথা ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু ভদ্রেশ্বরের শ্বেতা আগরওয়ালের ক্ষেত্রে একথা খাটে না। আইএএস পরীক্ষায় উনিশ র‍্যাঙ্ক করার পরেও তাঁর পা মাটিতে মাথা আকাশে। দুটি কথা তিনি ভোলেননি। তাঁর সাফল্যের ভরকেন্দ্র হলো বাবা সন্তোষ আগরওয়াল ও মা প্রেমা আগরওয়ালের প্রেরণা। আর, তাঁর শিকড় এই পশ্চিমবঙ্গে। তিনি বেঙ্গল ক্যাডারের অফিসার হয়েই কাজ করতে চান।

বাঙালি হোক বা তামিল— ভারতীয় সমাজ পরিবারভিত্তিক। তাই ভারতীয়রা 'শিকড়' কথাটির অর্থ যেভাবে করেন সারা বিশ্ব সেভাবে পারে না। শ্বেতার সঙ্গে তাঁর বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

শ্বেতার বাবা সন্তোষ আগরওয়াল ভদ্রেশ্বরের একটি ছোট মুদিখানা দোকানের মালিক। অল্পবয়েসেই জীবনযুদ্ধে নামতে হয়েছিল বলে উচ্চ মাধ্যমিকের বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী প্রেমা যখন ক্লাস টেনে তখন বিয়ে হয়ে যায়। তাই দু'জনেই চেয়েছিলেন তাঁদের অপূর্ণ সাধ-স্বপ্ন মেয়ের জীবনে পূর্ণতা পাক। মেয়ে পাঁচজনের একজন হয়ে উঠুক। কিন্তু চাইলেই তো হয় না! মুদিখানার সামান্য আয়ের নিরিখে চাওয়াটা খুব বড়ো হয়ে যায় যে। প্রাণান্তকর লড়াই করতে হয়। তাই বলে ওরা মেয়ের ওপর কিছু চাপিয়ে দেননি। যথেষ্ট স্পেস দিয়ে মেয়েকে বেড়ে উঠতে দিয়েছেন। সে ঋণ স্বীকার করেন শ্বেতাও, 'আমার বাবা-মা-র তুলনা হয় না। এত অভাবের মধ্যেও ওরা আমাকে সেরা স্কুল-কলেজে পড়িয়েছেন।' শ্বেতার প্রথম স্কুল চন্দননগরের সেন্ট জোসেফ। তারপর ব্যান্ডেলের অক্সিলিয়াম কনভেন্ট। সব শেষে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক। ঈর্ষণীয় পরিক্রমা! শ্বেতা বলেন, 'আমার বাবা-মা হিন্দি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। কিন্তু বরাবর চেয়েছেন আমি যেন ইংরেজি

মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করি। আমার দেশের জন্য কাজ করার ইচ্ছেটাও ওদের কাছ থেকে পাওয়া।'

বাড়িতে সব ধরনের সহযোগিতা পেলেও শ্বেতার সাফল্য খুব সহজে আসেনি। ২০১৩-১৪ সালের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ছিলেন ৪৯৭ নম্বরে। ভেঙে পড়েননি শ্বেতা। ২০১৪-১৫ সালে আবার সিভিল সার্ভিসে বসেন কিন্তু আইএএস-এর সুযোগ সেবারেও জোটেনি। ১৪১ নম্বরে ছিলেন বলে আই পি এস-এ সুযোগ পান। আপাতত শ্বেতা হায়দরাবাদের পুলিশ অকাদেমিতে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। এরই মাঝে সময় করে ২০১৫-১৬ সালে ইউপিএসসি পরীক্ষায় বসেন। ফল বেরোলে দেখা যায় সারাদেশের মধ্যে তাঁর স্থান উনিশ নম্বরে।

কেমন লাগছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই শ্বেতা প্রথম শিকড়ের কথা বলেন। তার জবাব 'দারুণ। সম্ভবত আমিই ভদ্রেশ্বরের প্রথম আইএএস। এই ব্যাপারটা দারুণ এক্সাইটিং। আমার শেকড় আছে এখানে— এই বাংলায়।'

খুশি শ্বেতার বাবা-মাও। মেয়ের কথা বলতে গিয়ে চোখে জল এসে গেল সন্তোষবাবুর। অভাব-অনটনের কথা যেমন বললেন বন্ধুবান্ধব পাড়া-প্রতিবেশীর কথাও বাদ পড়ল না। বিশেষ করে দুঃখের দিনে যারা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। চন্দননগরের বিজয় গুহ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র মল্লিক এরকমই দু'জন। আর আছেন মহম্মদ ইসলাম উদ্দিন। শ্বেতার মা প্রেমাদেবী বললেন, 'ও যা করতে চেয়েছিল তাই করতে পারবে তাতেই আমি খুশি।'

পরিবারের পর এবার মাস্টারমশাইরা। শ্বেতাকে যারা তৈরি করেছেন সেই ইনস্টিটিউট ফর সিভিল সার্ভিস অ্যাসপির‍্যান্টস (আই সি এস এ)-র চেয়ারম্যান জ্যোতির্ময় পাল চৌধুরী বললেন, 'আমাদের ইনস্টিটিউটে শ্বেতার রেজাল্টই সব থেকে ভালো। তবে আমার কাছে সব থেকে খুশির খবর হলো শ্বেতার বেঙ্গল ক্যাডর হিসেবে কাজ করতে চাওয়া। বাংলার ছেলেমেয়েরা আই এ এস অফিসার হতে চায় না। তারা ভাবে আমলা হলেই রাজনৈতিক নেতাদের তাঁবেদারি করতে হবে। ধারণাটা ভুল। শ্বেতাকে দেখে যদি বোধোদয় হয় তবে সেটা খুবই ভালো ব্যাপার হবে।'

শ্বেতা যদি পথিকৃৎ হতে পারেন সত্যিই সেটা খুব ভালো হবে। কারণ এই মুহূর্তে মেরুদণ্ড সোজা রেখে কাজ করবেন এমন আমলার খুবই প্রয়োজন। শ্বেতা আগরওয়াল তাঁর শিকড়ের কাছাকাছি থাকতে চান— এই একটি চাওয়া থেকে মনে হয় তিনি তাঁর মেরুদণ্ডটি সোজা রাখতে চান। আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

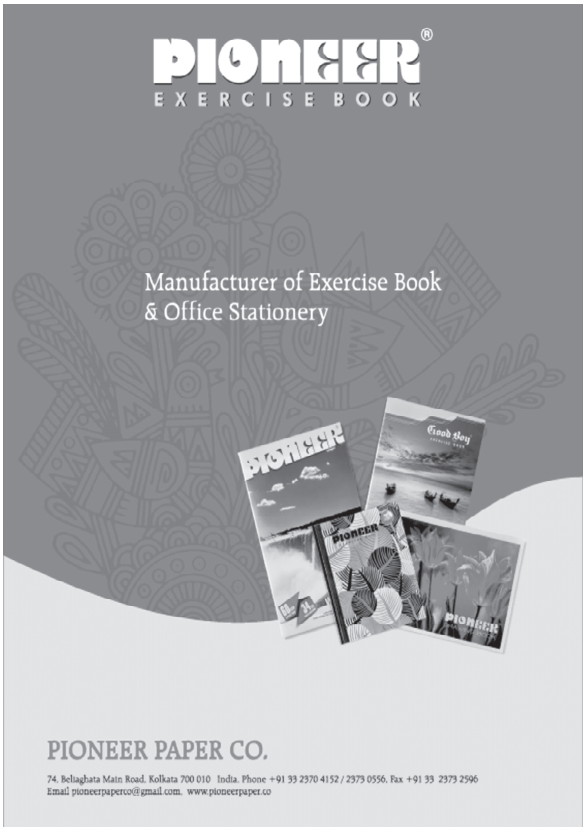

'হৃদয়ের মাধ্যমে শিল্পীকে তার বিষয়বস্তু দর্শন করতে হবে। অনুপম পরিচ্ছদে সজ্জিতা ভারতীয় রমণী, দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র হাতে শিবভাবব্যঞ্জক ভিক্ষুক, শ্রমিক— যারা সকল দেশেই সুন্দর কিন্তু ভারতবর্ষে যেন স্বীয় অননুকরণীয় শান্তভাব ও শিষ্টতা বলে সমধিক মর্যাদাসম্পন্ন। মন্দিরের পুরোহিত, নদীবক্ষে নৌকায় উপবিষ্ট মাঝি, শিশুসন্তান-ক্রোড়ে মাতা, বিবাহবাসরে গমনোদ্যতা সুসজ্জিতা কুমারী— হে ভারতীয় শিল্পের ভারতীয় ছাত্রগণ, যে সৌন্দর্য তোমরা শিল্পে প্রকাশ করতে আগ্রহী— এইসব চিত্রের কোনটির মধ্যেই কি তোমরা তার কিছু দেখতে পাও না? জীবনের সন্ধানে এইসব ক্ষীণ রশ্মিপাত, যা তোমাদের দৃষ্টির দিগন্ত পথ উন্মোচিত করবে, তার মধ্য দিয়ে কি তোমরা অগ্রসর হতে পার না?'

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

মুসলমান তোষণের ট্রাডিশন সমানে চলেছে

পুস্তক প্রসঙ্গ

কল্যাণ ভঞ্জচৌধুরী

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারতে মুসলমানদের জেহাদি কার্যকলাপ সম্পর্কে বাংলায় নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত। সেই সব প্রবন্ধ আয়তনে ক্ষুদ্র হওয়ার জন্য পাঠকদের আগ্রহ মেটাতে পারত না। আগ্রহী পাঠকদের অতৃপ্তি থেকেই যেত। সাম্প্রতিককালে এই পরিস্থিতি পাল্টেছে। এখন বাংলায় অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে যা আয়তনে দীর্ঘ। ফলে স্বাভাবিক কারণে প্রচুর তথ্যপূর্ণ হতে পেরেছে। এরকম একটি গ্রন্থ যার শিরোনাম---কাপুরুষ কাফের। লেখক কিশোর বিশ্বাস বলতে চেয়েছেন মুসলমানদের চোখে হিন্দুরা কাফের অর্থাৎ 'অবিশ্বাসী' এবং তারা কাপুরুষ। লেখক তাঁর দীর্ঘ ১২৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী গ্রন্থে দেখিয়েছেন মুসলমানেরা এই ভারতে অবিরত হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, তাদের মন্দির ধ্বংস করেছে, সম্পত্তি লুঠ করেছে, হিন্দু নারী হরণ করেছে এবং সেই সাথে চালিয়েছে ব্যাপক ধর্মান্তর। মজার কথা, মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুদের উপর যেমন এই ধরনের অত্যাচার হয়েছে, বৃটিশ আমলে তথা স্বাধীন ভারতে এই অত্যাচারের অবিকল পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

কিন্তু লেখক যে বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন সেটি হিন্দুদের কাপুরুষতা। হিন্দুরা মুসলমানদের আক্রমণে বাধা তো দেয়নি উপরন্তু তাদের সমর্থন করেছে এবং যে মানুষটি সবচেয়ে বেশি এই কাজ করেছেন তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি দেখিয়েছেন '৪৬-এর কলকাতা দাঙ্গা তথা পরবর্তী নোয়াখালি দাঙ্গা এবং '৪৭-এর পুনরায় কলকাতা দাঙ্গার কারিগর সুরাবর্দীকে গান্ধী নিন্দা করেননি, বরং তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। এর আগে ১৯২০-র দশকে মোপলারা যখন মালাবারে বিপুল সংখ্যক হিন্দুদের হত্যা ও ধর্মান্তরিত করেছিল তখন গান্ধী তাদের নিন্দা করেননি, বরং প্রশংসা করেছিলেন। সারা জীবন তিনি এইভাবে মুসলমানদের মৌলবাদকে সমর্থন করেছেন। তিনি কাশ্মীরের মসনদে চান, অথচ প্রবল হিন্দু বিদ্বেষী হায়দরাবাদের নিজামের উপর

যাতে এতটুকু আঁচড় না লাগে সে জন্য বারে বারে বিবৃতি দিয়েছেন। স্বাধীনতার পরে পরেই মুসলমান হানাদাররা কাশ্মীরের রাজৌরি এবং বারমুল্লাতে অন্তত ৩০ হাজার হিন্দু হত্যা করে। নিহত হিন্দুদের বিধবা স্ত্রীরা জহরব্রত পালন করে। এই মর্মস্পর্শী ঘটনার ব্যাপারে গান্ধী পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে একটাও কথা বলেননি, অথচ পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য অনশন করলেন।

গান্ধীর মুসলমান তোষণের ট্রাডিশন সমানে চলেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী নেহরু একই পদ্ধতিতে মুসলমানদের সমর্থন করেছেন। কলকাতা ও নোয়াখালিতে মুসলমানরা হিন্দু হত্যার অভিযান চালালে নেহরু একটিবার বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর নিন্দা করেননি। শুধু তাই নয়, কলকাতা ও নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চল দেখতে আসেননি; অথচ কদিন বাদে যখন বিহারে দাঙ্গা হলো তিনি বিহারে চলে গেলেন এবং দাঙ্গা থামানোর জন্য এরোপ্লেন থেকে বোমা বর্ষণের নির্দেশ দিলেন। তাঁর গুরু গান্ধীও সঙ্গে সঙ্গে অনশন করলেন। নেহরুর চাপে কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ৩৭০ ধারা প্রয়োগ করা হয়। যাতে প্রকারান্তরে কাশ্মীরকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ধরা হয়েছে। কাশ্মীর সমস্যার মূল এখানেই।

তাঁর কন্যা ইন্দিরা গান্ধী একই পথে হেঁটেছেন। পাকিস্তানকে খুশি করার লক্ষ্যে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ভুট্টোর সঙ্গে বিখ্যাত সিমলা চুক্তি করেছেন যা জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। এই চুক্তির বলে পাকিস্তানকে পাঁচ হাজার বর্গমাইল এলাকা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বিনা শর্তে মুক্তি পেল ৯৩ হাজার পাক সৈন্য। ইন্দিরা পুত্র রাজীব গান্ধী একই ভাবে মুসলমান তোষণ করেছন। তিনি শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় অমান্য করে মৌলবাদীদের হাত শক্ত করলেন। তাঁর পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং নানা ভাবে মুসলমান মৌলবাদকে সাহায্য করে দেশে অস্থিরতা এনেছেন। মনে রাখতে হবে, তাঁর মুসলমান প্রেমের ফলে মুসলমানদের জেহাদি মনোভাব বেড়ে যায় এবং তাঁর সময়েই কাশ্মীর থেকে কয়েক লক্ষ হিন্দু পণ্ডিতকে মেরে কাশ্মীর ছাড়া করা হয়। তিনি কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা নেননি। এই ভাবে লেখক হিন্দু নেতাদের কাপুরুষতার উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এই গ্রন্থটি পড়লে কিছু অতৃপ্তি থেকে যায়। কেন হিন্দু নেতারা পদে পদে

কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছেন, কেন তারা মুসলমান মৌলবাদীদের রুখতে পারেননি— এই বিষয়টি নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলে ভাল হোত। লেখক গান্ধীর সময় থেকে বক্তব্য শুরু করেছেন। কিন্তু এই কাপুরুষতার ইতিহাস দীর্ঘ।

মুসলমান যুগের কথা থাক, বৃটিশ ভারতের শুরুতে যখন ওয়াহবি আন্দোলন হয়েছিল তখন বাংলায় তিতুমির, শরিয়া তুল্লারা জোর করে কয়েক লক্ষ হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করেছিল। ১৯ শতক জুড়ে মুসলমান ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের আকাশে বাতাসে একটাই সুর ছিল— মুসলমানদের সংখ্যা বাড়াও। সেই সময় রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, প্রমুখ হিন্দু মনীষী এ জন্য এতটুকু উদ্বেগ প্রকাশ করেননি, উপরন্তু মুসলমান প্রেমে বিভোর ছিলেন। একমাত্র বঙ্কিমচন্দ এ বিষয়ে হিন্দুজাতিকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। হিন্দু নেতাদের উদাসীনতার জন্য মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল। ১৮৫১ সালে বাংলায় যেখানে মুসলমানদের হার ছিল ৪৫ শতাংশ তা ৫০ বছরের মধ্যে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯০১ সালে হলো ৫৫ শতাংশ। অর্থাৎ হিন্দুরা ২০ শতকের শুরুতেই সংখ্যালঘু হয়ে গেল। অতএব হিন্দুদের কাপুরুষতার ইতিহাস গান্ধীর সময় থেকে নয়।

লেখক শ্রী বিশ্বাসের দুটি বক্তব্যের বিষয়ে একমত হতে পারলাম না। তিনি লিখেছেন গোলটেবিল বৈঠকের 'একটি সিদ্ধান্তও ভারতের গণতন্ত্র বা জাতীয়তার পক্ষে ছিল না" (পৃ. ৮১)। এই উক্তি প্রমাদ পূর্ণ। পর পর তিনটি গোলটেবিল বৈঠকের রিপোর্ট পড়লে দেখা যাবে সেদিন বৃটিশ নেতারা ছাড়া যেসব ভারতীয় বক্তা আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের একক লক্ষ্য ছিল ভারতকে গণতন্ত্রের কঠিন বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করা। গান্ধী নেহরুরা যেহেতু গোলটেবিল বৈঠকের নিন্দা করেছেন তাঁদের বশংবদ ঐতিহাসিকেরা এই বৈঠকের মধ্যে গঠনমূলক কিছু পাননি।

দ্বিতীয়ত, লেখক কংগ্রেসী নেতা ও ঐতিহাসিকদের মতো জিন্নাকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন। তাঁর বক্তব্য, জিন্না 'পাকিস্তান পেয়েছেন ইংরেজদের দালালি করে আর কংগ্রেসের বিরোধিতা' (পৃ. ৪৯) করে। তিনি জিন্নার অসাধারণ সংগঠন শক্তি, ক্ষুরধার রাজনৈতিক প্রতিভাকে অস্বীকার করেছেন। ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার দাবিতে জিন্না অবিরত লর্ড মিন্টো, লর্ড চেমসফোরড, লর্ড ইউলিংডন প্রমুখ ভাইসরয়দের সঙ্গে অবিরত বাকযুদ্ধ করেছেন। অন্য পক্ষে গান্ধী এই ভাইসরয়দের চাটুকারিতা করেছেন। জিন্না ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গোখলে প্রভৃতি নেতাদের মতো সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। বলা বাহুল্য গান্ধীর অসংসদীয় আন্দোলনে নয়, সংসদীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন হয়েছিল। কংগ্রেসী ঐতিহাসিকরা গান্ধী প্রমুখ নেতার সমর্থন করে এই ভাবে ইতিহাস বিকৃত করেছেন এবং শ্রী কিশোর বিশ্বাসের মতো আমরা তাঁদের পাতা ফাঁদে পড়েছি।

তৃতীয়ত, লেখক কংগ্রেসী ঐতিহাসিকদের সুরে বলেছেন— 'ইংরেজরা চিরকালই মুসলমানদের বন্ধু ছিলেন' (পৃ. ৯৫)। কিন্তু ঘটনা ঠিক উলটো। ইংরেজরা চিরকালই মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাঁরা অখণ্ড ভারত চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড, এটলি, ভাইসরয় লিনলিথগো, ওয়াভেল এমনকি মাউন্টব্যাটেন ভারত ভাগের বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের দুর্বলতার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভারত বিভাগে রাজি হন।

লেখক এই গ্রন্থে অজস্র তথ্য দিয়েছেন কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র দেননি। যেমন তিনি লিখেছেন লন্ডনের 'দি ইকনমিস্ট' পত্রিকা ইন্দিরা গান্ধীকে ভারত সম্রাজ্ঞী তকমা দিয়েছিল। পত্রিকাটির কোন তারিখের সংখ্যায় এই উক্তি করা হয়েছিল জানতে ইচ্ছা করে। এমনি অনেক জায়গায় লেখক বক্তব্যের সমর্থনে তথ্য উল্লখ্য করেননি, কখনও বা উল্লিখিত গ্রন্থের পৃষ্ঠা জানাননি। ফলে আগ্রহী পাঠকদের মনে একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। যাহোক, এই ধরনের ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থটি যাঁরা হিন্দুত্বকে ভালোবাসেন এবং হিন্দুদের শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য চিন্তিত তাদের পক্ষে অবশ্যপাঠ্য এবং সংগ্রহণীয়।

কাপুরুষ কাফের—কিশোর বিশ্বাস। প্রকাশক : জনমন, কলকাতা। প্রকাশ কাল : ২০১৬। মূল্য : ১৫০ টাকা।

নাগপুরে সঙ্ঘের তৃতীয়বর্ষে সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সহ সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে।

বলরাজ মধোকের প্রয়াণে একটা যুগের অবসান হলো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ‘‘প্রয়াত মধোকজীর জীবন দেশ ও জাতির সেবায় ছিল উৎসর্গীকৃত। দেশবিভাজনের সময় তাঁর নেতৃত্বে যে কাজ হয়েছিল তা সর্বদা স্মরণে থাকবে। এমন একজন উদ্যমী, উৎসর্গীকৃত এবং আপন আদর্শের প্রতি অবিচল ব্যক্তিত্ব এখন আর আমাদের মধ্যে নেই।’’ এক শোকবার্তায় প্রয়াত বলরাজ মধোকের প্রতি এভাবেই শ্রদ্ধা জানিয়েছেন আর এস এসের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত ও সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করে বলেছেন, তিনি ছিলেন দেশ ও সমাজের সেবায় স্বার্থলেশশূন্য এক ব্যক্তিত্ব।

প্রখর জাতীয়তাবাদী, সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক ও ভারতীয় জনসঙ্ঘের জাতীয় সভাপতি অধ্যাপক বলরাজ মধোক গত ২ মে নয়া দিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বৎসর। কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। ১৯২০ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কাশ্মীরের বালটিস্থানের স্কারদু (এখন পাক অধিকৃত)-তে তাঁর জন্ম। লাহোরের ডিএভি কলেজ থেকে ইতিহাসে অর্নাস নিয়ে বিএ পাশ করেন। লাহোরে পড়াশোনার সময় ১৯৩৮ সালে তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন এবং ১৯৪২ সালে প্রচারক হিসেবে জম্মু-কাশ্মীরে তাঁকে পাঠানো হয়। পাকিস্তানের ছক ভেস্তে দিয়ে তিনি কাশ্মীর রক্ষার জন্য এক কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছিলেন। দেশের সর্ববৃহৎ ছাত্রসংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ে অখিল ভারতীয় জনসঙ্ঘেরও। ১৯৪৭-৪৮ সালে পাকিস্তানের রাজাকার বাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করে। পাকিস্তানের পরিকল্পিত আক্রমণের মোকাবিলা করতে সেসময় তিনি পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরার সহযোগিতায় প্রজা পরিষদ নামে এক দল গঠন করেন। এ সময় একদিন তাঁর বাড়িতে জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজ হরি সিংয়ের একজন দূত আসেন এবং তাঁর কাছে অনুরোধ জানান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতীয় সেনা না আসছে ততক্ষণ যেন তিনি শ্রীনগর বিমান বন্দর রক্ষার ব্যবস্থা করেন। সে সময় তিনি সঙ্ঘচালকের দায়িত্বে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ২০০ জন প্রশিক্ষিত স্বয়ংসেবক নিয়ে নিজে বিমানবন্দর রক্ষার কাজে লেগে পড়েন।

ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সঙ্গে মিলিতভাবে তিনি জনসঙ্ঘের সংবিধান রচনা করেন। ১৯৬৮ সালে তিনিই প্রথম অযোধ্যার শ্রীরামমন্দির হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানান। গোরক্ষা আন্দোলনে তিনি প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। তিনি নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রীরূপে দেখতে চাইতেন। মনে করতেন নরেন্দ্র মোদী একদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন। তিনি তাঁর স্বপ্নকে সাকার হতে দেখতে পেয়েছেন। যাটের দশকের রাজনীতিতে তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৭ সালে তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় জনসঙ্ঘ সংসদে ৩৫টি আসন দখল করে। সেই সময় পর্যন্ত এটাই ছিল জনসঙ্ঘের সর্বোচ্চ প্রাপ্ত আসন। জরুরি অবস্থার সময় তিনি ১৮ মাস কারাবন্দি ছিলেন।

আদর্শবাদের ক্ষেত্রে চরমপন্থী এবং আক্রমণাত্মক হলেও তাঁর স্বভাবে কিন্তু কোনো ক্লেদ স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি সরল মনে সবাইকে বিশ্বাস করতেন। এতে অনেক সময়ই তাঁকে অসুবিধেয় পড়তে হোত।

তাঁর কন্যা মাধুরী মধোক পিতার দুটি বই—‘রেশনল অফ হিন্দু স্টেট’ এবং ‘ইন্ডিয়া অন দ্য ক্রসরোড’-এর কথা বলতে গিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ড. বি আর আম্বেদকর কেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন তার স্মৃতিচারণা করেছেন। বস্তুত বলরাজ মধোকের জীবনাবসানে একটা যুগের শেষ হলো।

ভূপেন্দ্র কুমার বসুর স্মরণ সভা

গত ২ মে কটকে কটক ক্লাব অ্যানেক্সে ভূপেন্দ্র কুমার বসুর উদ্দেশে এক স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ সেবা প্রমুখ অজিত প্রসাদ মহাপাত্র, বিএমএস-এর অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক কে সি মিশ্রা, প্রবীণ প্রচারক তথা হিন্দু জাগরণ সমিতির কার্যকর্তা হরিহর নন্দ, ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় কুমার নন্দী, ওড়িশার পশ্চিমপ্রান্ত সঙ্ঘচালক বিপিন বিহারী নন্দ, অখিল ভারতীয় কার্যকারিনীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক মোহিনীমোহন মিশ্র-সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব তাঁর স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন। ওড়িশা প্রদেশের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তথা বিবিধ কাজের প্রেরণাপুরুষ ভূপেন্দ্রকুমার বসু প্রয়াত হয়েছেন গত ২০ এপ্রিল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর। সমগ্র ওড়িশায় তিনি ভুপেনবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘদিন প্রান্ত সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। ওড়িশার জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক রাষ্ট্রদীপ পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রতিথযশা আইনজীবী ছিলেন।

মালদা বিবেকানন্দ শাখার বার্ষিক উৎসব

গত ২২ মে মালদহ জেলার পুরাতন মালদা নগরের বিবেকানন্দ শাখার বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১১০ জন স্বয়ংসেবক নিযুদ্ধ, দণ্ড, ব্যায়ামযোগ, যোগাসন, খেলা, গোপুরম্‌ খুবই যোগ্যতার সঙ্গে পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সাহাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রসেনজিৎ শাহু। উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা কার্যবাহ শ্যামল পাল। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজোল মহকুমা কার্যবাহ জয়দেব সাহা। স্বয়ংসেবকদের পরিবারের সবাই সঙ্ঘস্থানে উপস্থিত ছিলেন।

‘শ্রদ্ধা’র ৭৪ তম শ্রদ্ধাঞ্জলি

গত ১৫ মে বীরভূম জেলার সিউড়ী বিদ্যাসাগর কলেজ পাড়ার ১২০০ পূর্ণচন্দ্র দর্শনধন্যা, ৯৬ বৎসর বয়স্কা গৃহিণী শ্রীমত্যা রানী বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর ভদ্রাসনে ‘শ্রদ্ধা’র বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। ‘শ্রদ্ধা’র নিয়ম মতো তিনবার ব্রহ্মনাদ, শঙ্খধ্বনি ও মঙ্গলদীপ প্রজ্বলনের

মাধ্যমে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। দীপ প্রজ্বলন করেন বীরভূম জেলা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়। কলেজ পাড়ার মাতৃমণ্ডলী ‘তুমি মঙ্গল কর নির্মল করে, মলিন মর্ম মুছায়ে’ উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ৯৬টি পদ্মফুলের মালা পরিয়ে মা’কে শ্রদ্ধা জানান শ্রদ্ধার সভাপতি নিরঞ্জন হালদার। রানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত-পা ধুইয়ে তুলসী, চন্দন, ফুল দিয়ে পূজা করেন তাঁর বড়বৌমা শ্রীমতী শিবরানী বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতাকে পরিধেয় বস্ত্র, নামাবলী, ফল, মিষ্টান্ন ও গীতা শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে নিবদেন করা হয়। শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন পরিচালন সমিতির অন্যতম সক্রিয় সদস্য বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিতপাবন বৈরাগ্য। পরিবারের পক্ষ থেকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন শ্রীমত্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাতজামাই শোভন মুখোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার এই অনুষ্ঠান অভিনব বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। সর্বশেষে শ্রদ্ধার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সদস্য কৃষ্ণেন্দু ঠাকুর।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গের সহ সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষের পিতৃদেব খগেন্দ্রনাথ ঘোষ গত ১৬ মে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর সংলগ্ন ভাকুড়ি গ্রামে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, ধনঞ্জয় ঘোষ বড়পুত্র।

* * *

ঝাড়গ্রাম শহরের স্বয়ংসেবক তথা মানবসেবা প্রতিষ্ঠানের ঝাড়গ্রাম আশ্রম ছাত্রাবাস সমিতির সদস্য, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের, ঝাড়গ্রাম জেলা সমিতির সদস্য মুকেশ প্রসাদের পিতা শ্রীরামগরিব প্রসাদ ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, পুত্রবধূ, ২ কন্যা এবং নাতি- নাতনিদের রেখে গেছেন।

শিল্পী সঙ্ঘের নাটক
মানবিক মূল্যবোধের দলিল
‘যুধিষ্ঠির বাবু’

বিকাশ ভট্টাচার্য

প্রচেত গুপ্ত বর্তমান সময়ের একজন বিশিষ্ট গল্পকার, যাঁর গল্পের মধ্যে থাকে মানব মনের নানান অলিগলির হদিশ। স্বভাবতই নাট্যকাররা এই সব মানবিক কাহিনির দিকে হাত বাড়াবেন। বিশিষ্ট নাট্যকার তীর্থঙ্কর চন্দ প্রচেত গুপ্তের লেখা ‘যাদববাবু মিথ্যে কথা বলেন না’ গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাটকের নাম ‘যুধিষ্ঠির বাবু’। প্রযোজনা করেছে শিল্পী সঙ্ঘ। স্বল্প সময়ের মধ্যে শিল্পী সঙ্ঘ বেশ কিছু ভালো নাটক মঞ্চস্থ করে ফেলেছে। তারমধ্যে রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তীর মজার নাটক ‘কোকিল স্যার’ এই প্রতিবেদকের দেখা। সম্প্রতি দেখার সুযোগ মিলল এদের সাম্প্রতিক নাটক ‘যুধিষ্ঠির বাবু’র।

‘যুধিষ্ঠির বাবু’ এমন একজন মানুষের গল্প যিনি ছোটবেলায় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন মিথ্যে না বলার। সমাজ-সংসার সবার সঙ্গে লড়াই করে সারাজীবন তিনি সত্য বলেছেন। অসত্য, অন্যায়ের সঙ্গে হাজার প্রলোভনেও আপোশ করেননি। বাড়ির সকলে তাঁকে অনেক বুঝিয়েছেন। কিন্তু তিনি দিকভ্রান্ত হননি। সেই যাদববাবুই একদিন মুখ ফসকে তাঁরই এক ছাত্রকে বলে ফেলেন এমন একটা কথা যা সত্যি নয়। বলে ফেলেই তিনি বুঝতে পারেন কি মারাত্মক ভুল তিনি করে ফেলেছেন। যাদববাবু নিজের মধ্যেই কুঁকড়ে যেতে থাকেন। এ যেন তাঁর এক অস্তিত্ব সঙ্কট। মানুষটাকে নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন বাড়ির সবাই। বিশেষ করে তাঁর ছেলে। এতদিন তাঁরা প্রকাশ্যে রাগ বা বিরক্তি দেখালেও মনে মনে শ্রদ্ধা করে এসেছেন এই মানুষটাকে। কারণ এই মানুষটির জন্যেই সমাজের সকলে এই পরিবারটিকে— পরিবারের সবাইকে একটু অন্য চোখে দেখেন, সমীহ করেন। আজ তাঁর এই মানসিক সঙ্কটে দিশেহারা সকলে। পাড়ার বিশিষ্টজনেরা মিলে তাঁকে সম্বর্ধনা দেবেন। প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে। এমন সময় যাদববাবু বেঁকে বসেন।

এখন উপায় কী? যাদববাবুর ছেলে একটা রাস্তা বের করে। সে নানা উপহার সামগ্রী

নিয়ে সেই বাচ্চা ছেলে অরণির কাছে যায়। তাকে বলা হয় যাদববাবুকে এসে বলতে যে তিনি মোটেই মিথ্যে কথা বলেননি। যেটা তিনি বলেননি অর্থাৎ সত্য কথাটিই তিনি বলেছিলেন। এখন হয়তো ঠিক মনে করতে পারছেন না। এ পর্যন্ত সব ঠিকই আছে। যাদববাবুর সামনে এসে বাচ্চা ছেলেটি বলবে তিনি মোটেই মিথ্যে বলেননি। তাঁর অনুতাপের কোনো কারণ নেই।

কিন্তু বাস্তবে যাদববাবুর সামনে এসে সেই বাচ্চা ছেলেটি বারবার রিহার্সাল করা কথা কটি যাদববাবুর মুখের ওপর বলতে পারে না। যে স্যারের পায়ে হাত দিয়ে বলে, আমি মিথ্যে বলতে পারব না স্যার। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আজ থেকে আমি কখনও মিথ্যে বলব না। যাদববাবুর বুক থেকে যেন পাহাড় নেবে যায়। অনুতাপ মুক্ত যাদববাবু বলেন, সম্বর্ধনা সভায় আমার চেয়ারের পাশে আর একটা চেয়ারে এই ছেলেটি বসবে। আজ আমি সার্থক। সফল। ম্যারাথন রেসের ব্যাটনটা আমি ঠিক মানুষের হাতেই তুলে দিয়েছি।

নাটকটির সম্পাদনা ও নির্দেশনা সীমা মুখোপাধ্যায়ের। প্রথম দৃশ্যেই তাঁর প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখা যায়। অভিনয়ে বিমল চক্রবর্তী এককথায় চরিত্রের সঙ্গে যেন মিশে গেছেন। তিনি দক্ষ অভিনেতা। বিশেষত শেষ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় ভোলার নয়। এছাড়া স্ত্রী, ছেলে, দারোগা, সম্বর্ধনার আয়োজক চরিত্র অনুযায়ী যথাযথ। ছোট বাচ্চা অরণি ও লিচু বেশ স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় করেছে। মঞ্চভাবনায় ত্রিগুণাশঙ্কর। তাঁর মঞ্চ পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। বাদল দাসের আলো বিষয় উপযোগী। নেপথ্য সঙ্গীতে সৃজা চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি অনেকদূর যাবেন।

নাটকটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় নির্মিত। অত্যন্ত সুন্দর একটি প্রযোজনা। এ নাটকের বহুল প্রচার হওয়া দরকার। মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সময়ে এ নাটক আমাদের আশার আলো দেখায়। শিল্পীসঙ্ঘকে ধন্যবাদ এমন একটি নাটক আমাদের উপহার দেওয়ার জন্য।

শব্দরূপ-৭৮৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

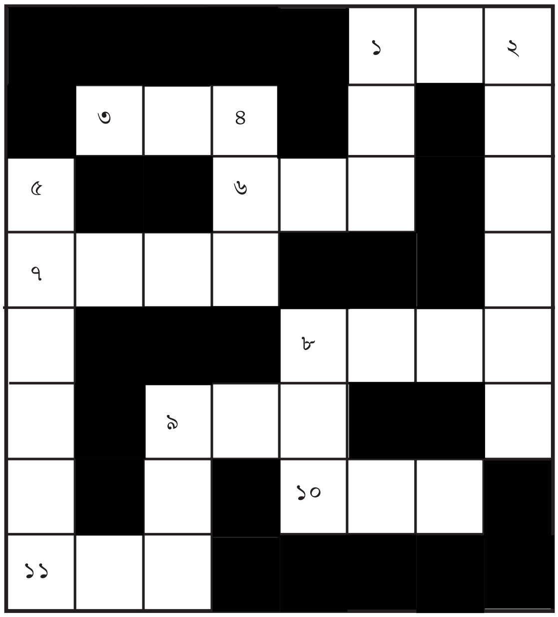

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** ‘ছত্রপতি’ নামে সমধিক পরিচিত, **৩.** ‘কিরাতার্জুনীয়’ রচয়িতা সংস্কৃত কবি, **৬.** বিদ্যুৎ, **৭.** জ্ঞানের বা বুদ্ধির উন্মেষ, **৮.** শুদ্ধ বাংলায় ‘ডায়াবিটিস’, **৯.** সহকারী গায়ক, যে ধুয়া ধরে, **১০.** বিষ্ণুর প্রথম অবতার, **১১.** সুন্দর, কান্ত, চারু, কোমল।

উপর-নীচ : **১.** শিবপত্নী, দুর্গা, **২.** ইন্দ্র; সংস্কৃত কথাসাহিত্যে উল্লিখিত বিদ্যাধরগণের ভূপতি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ, **৪.** ‘একবার — দে মা, ঘুরে আসি’, **৫.** অসম্বন্ধ কথা, প্রলাপ; সুকুমার রায়ের অসামান্য সৃষ্টিকর্ম, **৮.** মর্ম (পদ্যে), **৯.** লেখার কালির আধার।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৮৬

		ফ	লা	হা	র		না
কা	সু	ন্দি			জ		চ
	ন্দ		মে		ত	প	ন
	র	জ	নী			রে	
	ব			ধ	নে	শ	
বি	ন	তা		ব		না	
বা		লি			পা	থ	র
গি		ম	ন	বে	ড়ি		

সঠিক উত্তরদাতা

সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম
সদানন্দ নন্দ
লাভপুর, বীরভূম
টিঙ্কু হালদার
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

 ৭৮৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ২০ জুন ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

এখন ‘থিয়োক্রেটিক স্টেট’-এর বিরুদ্ধ ‘সেকুলার স্টেট’ শব্দটি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই শব্দ পাশ্চাত্য থেকে অনুকরণ করা। আমাদের এর প্রয়োজন নেই। পাকিস্তান থেকে আলাদা বলার জন্য আমরা ‘সেকুলার স্টেট’-এর প্রয়োগ করছি। এতে ভ্রান্তি উৎপন্ন হচ্ছে। ধর্মের ইংরেজি যেমন রিলিজিয়ন করা হয়েছে, তেমনি লোকের মনে হয়েছে সেকুলার স্টেট-এর অর্থ ধর্মহীন রাজ্য। কিছু লোক বলেন ধর্মহীন রাজ্য এবং কিছু লোক অর্থ করেছেন ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ রাজ্য। কিন্তু এই অর্থ সর্বৈব ভুল। কেননা দেশ কখনো ধর্মহীন হতেই পারে না; ধর্মনিরপেক্ষও থাকতে পারে না। যেমন অগ্নি তাপনিরপেক্ষ হতে পারে না। অগ্নি তাপহীন অথবা তাপবিরোধী হয়ে গেলে তা আর অগ্নি থাকবে না। সেরকম দেশ— যার কাজই হলো ধর্মকে টিকিয়ে রাখা। সমাজে ধর্ম অর্থাৎ ল’ অ্যান্ড অর্ডার যাতে থাকে তা নিশ্চিত করাই রাজ্যের কাজ, সে কেমনভাবে ধর্ম থেকে আলাদা থাকতে পারে? এর অন্যথা হলে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ নিয়মহীন দেশে পরিণত হয়ে যাবে। যেখানে নিয়মহীনতা সেখানে দেশের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা এবং দেশ পরস্পর বিরোধী। দেশকে ধর্মরাজ্য হতেই হবে। অন্যথায় তার মূল কর্তব্যই উপেক্ষিত হয়ে পড়বে।

ধর্মের সম্পর্কে চারিদিকে আজ যে ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়েছে তার অনেক কারণের মধ্যে একটি হলো বিদেশি শিক্ষা। ইংরেজি রিলিজিয়ন শব্দ ধর্মের শুদ্ধ অর্থকে নষ্ট করে দিয়েছে। ইংরেজ ভারতে এসে ধর্ম শব্দ শোনে। ধর্মের মতো ব্যাপক শব্দ তাদের কাছে ছিল না। তারা ধর্মের ইংরেজি করে ফেলল রিলিজিয়ন। অনুবাদের কারণে এরকম অনেক ভারতীয় শব্দ অনর্থে পরিণত হয়েছে। যে রকম ইংরেজিতে ‘সিস্টার-ইন-ল’ শব্দটি। এতে শালি অথবা বৌদি দুই-ই বোঝায়। ‘গ্র্যান্ডমাদার’ শব্দে ঠাকুমা অথবা দিদিমা দুই-ই বোঝায়। ভারতীয় ভাষায় এরকম হয় না। কিন্তু চলছে। এরকমভাবেই বহু শব্দ ভারতীয় প্রকৃতি, সভ্যতা, পরম্পরার অনুকূল নয়, সেগুলিও জোর করে অনুবাদ করে চালানো হচ্ছে। ধর্ম শব্দেরও এই দশা হয়েছে। ভারতে ধর্মের মধ্যে ‘রিলিজিয়ান’ আছে অর্থাৎ উপাসনা পদ্ধতি আছে। উপাসনা পদ্ধতি ধর্ম নয়। ভারতে বহু প্রকার উপসনা পদ্ধতি আছে। বহু প্রকার ঈশ্বরের প্রার্থনা আছে। বহু মত, বহু সম্প্রদায় আছে। কিন্তু ধর্ম এক। ধর্ম সবার জন্য কল্যাণকারী— ধর্ম মানুষের মোক্ষের পথ প্রস্তুত করে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

With Best

Compliments

from -

A

Well Wisher

B.M.

কেরলে বিজেপি-র উত্থান

ও রাজাগোপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পঞ্চাশের দশক থেকেই কেরলের রাজনৈতিক মানচিত্রে বিজেপির সক্রিয় অবস্থান। কিন্তু দক্ষকর্মী এবং সংগঠন থাকা সত্ত্বেও দল এতকাল বিধানসভার নির্বাচনে জেতেনি। এবারের নির্বাচনে সেই অভাব মিটল। ও রাজাগোপাল শুধু একটি আসনে জিতলেনই না সমগ্র রাজ্যে ১৪.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি জোট তাদের জমি অনেকখানি শক্ত করে ফেলল। রাজনৈতিক মহল মনে করছে শুধুমাত্র আসনসংখ্যা দিয়ে বিজেপির এই সাফল্য মাপা মোটেই উচিত হবে না। আগামীদিনে কেরলে নতুন জোট-রাজনীতির উদ্ভব হতে পারে এবং বিজেপি তার ধারকবাহক হয়ে উঠতে পারে বলে তাঁদের ধারণা।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে কেরলে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রধান মুখ হয়ে উঠেছিলেন বিজেপির ও রাজাগোপাল। বর্ষীয়ান এই নেতা ১৯৯২ এবং ২০০৪ সালে মোট দু' দফায় রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর মন্ত্রীসভায় গুরুদায়িত্বও পালন করেছেন কয়েকবার। কিন্তু বিধায়ক পদ অধরাই ছিল। এবারে ভাল ফল করার জন্য বিজেপি পূর্ণ শক্তিতে ঝাঁপিয়েছিল। আঞ্চলিক রাজনীতির সমীকরণ মেনে তাদের সঙ্গে জোট হয় ভারতধর্ম জনসেনা, (বিডিজেএস), জনাধিপত্য উরু বিকাসনা (জেওভিএম) এবং পিসি টমাসের নেতৃত্বাধীন কেরল কংগ্রেসের সঙ্গে। জোট রাজনীতির এই নতুন সমীকরণ যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে তার প্রমাণ ১৪.৬ শতাংশ ভোট। এই জনসমর্থন বিজেপি এর আগে কখনও কেরলে পায়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনেও কেরলে বিজেপির ফল ভালো হয়েছিল। কিন্তু সেবার ছিল প্রবল মোদী হাওয়া। চোখে পড়ার মতো বিষয় হলো দেশের সর্বত্র বিজেপির ভোট ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে কমেছে কিন্তু কেরলে বেড়েছে। কেরলের বিগত কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপি কত শতাংশ ভোট পেয়েছে একবার দেখে নেওয়া যাক। ২০০১ বিধানসভা ৫ শতাংশ, ২০০৪ লোকসভা ১০.৪ শতাংশ, ২০০৬ বিধানসভা ৪.৮ শতাংশ, ২০০৯ লোকসভা ৬.৩ শতাংশ, ২০১১ বিধানসভা ৬ শতাংশ, ২০১৪ লোকসভা ১০.৮ শতাংশ এবং ২০১৬ বিধানসভা ১৪.৬ শতাংশ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে কেরলে বিজেপির গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। ভবিষ্যতে বিজেপি এবং তার জোটসঙ্গীরা যে রাজ্যের চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে আশাবাদী অনেকেই।

এদিকে একটি নির্বাচনোত্তর সমীক্ষায় জানা যাচ্ছে বিজেপি সব থেকে বেশি সমর্থন পেয়েছে নায়ার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। মালয়লি সমাজে নায়াররা উচ্চবর্ণ হিসেবেই পরিচিত। এ ব্যাপারে বিজেপি জোট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফকে ছাড়িয়ে গেছে। পাশাপাশি দলিত ভোট পাওয়ার ক্ষেত্রেও বিজেপির উৎফুল্ল হবার যথেষ্ট কারণ আছে। মূলত বামপন্থীদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে পরিচিত দলিত ভোটের অধিকাংশই এবার গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। সমীক্ষা বলছে খৃষ্টানদের একাংশও এবার বিজেপির পক্ষে। এখানেই উঠেছে একটি গুরুতর প্রশ্ন। রাজাগোপাল কি পারবেন গোয়া মডেলের অনুসরণে রাজ্যে বর্ণহিন্দু আর খৃষ্টানদের নিয়ে একটি শক্তিশালী সামাজিক ক্ষেত্র তৈরি করতে? যদি পারেন তাহলে কেরলের আগামী রাজনীতির অভিমুখই বদলে যাবে বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছেন।

আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য উঠে এসেছে সমীক্ষাটিতে। বিজেপি জোট যা (১৪.৬ শতাংশ) ভোট পেয়েছে তার প্রায় ৯ শতাংশ এসেছে ২৫ বছরের কমবয়েসিদের কাছ থেকে। এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি কারণ এরাই রাজ্যের এবং দেশের ভবিষ্যত।

রাজ্যে বিজেপির এই সাফল্য ইউডিএফ এবং এলডিএফের একেবারে গোড়ায় আঘাত বলে মনে করছেন তথ্যাভিজ্ঞ মহল। বিশেষ করে খৃষ্টান এবং দলিতরা ছিলেন যথাক্রমে ইউডিএফ এবং এলডিএফের নির্ভরযোগ্য ভোটব্যাঙ্ক। সেখানে এই ধস যথেষ্ট রাজনৈতিক ইঙ্গিতবাহী। আবার পাশাপাশি নায়ার সম্প্রদায়ের মতো বর্ণহিন্দুদের সমর্থন এক অন্য সমীকরণের কথা বলে।

বিগত কয়েকটি নির্বাচনে আমরা কর্ণাটক, হরিয়ানা জম্মু-কাশ্মীরের মতো তথাকথিত 'অনুর্বর' রাজ্যে বিজেপির সাফল্য দেখেছি। সম্প্রতি দেখলাম অসমে। সব জায়গায় একটা ব্যাপার খুবই স্পষ্ট। আঞ্চলিক দলগুলি তাদের রাজনীতির জাতীয় মুখ করে তুলতে চাইছে বিজেপিকে। মিশতে চাইছে মূলস্রোতে। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিচারে এটা ভালো লক্ষণ। কেরল রাজ্যেও তা হতে পারে। অন্তত এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল তাই বলছে।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
30 May - 2016 - Rs. 10.00